অমানুষিক মানুষ

হেমেন্দ্রকুমার রায়

অমানুষিক মানুষ

হেমেন্দ্রকুমার রায়

Find More Books!

www.dlobl.org

www.shishukishor.org

[মাত্র ৩০ টাকা প্রতিমাসে লাইব্রেরী ফি দিয়ে পড়ুন, সংগ্রহ করুন কিংবা শেয়ার করুন বন্ধুদের মাঝে বাংলা সাহিত্যের জনপ্রিয় সব বই। আজই রেজিঃ করুন www.dlobl.org তে।]

শিকারির স্বর্গে

কলের গাড়ি, কলের জাহাজ, উড়োজাহাজ আর হাওয়াগাড়ির দৌলতে দুনিয়ার কোনও দেশই আজ আর অজানা নয়। ভূগোল সারা পৃথিবীর কোনও দেশের কথাই বলতে বাকি রাখেনি। পৃথিবীর বাইরে মঙ্গল প্রভৃতি গ্রহেরও মানুষ জীব আবিষ্কার করেছে। পণ্ডিতদের বিশ্বাস, ত্রিভুবন আজ তাঁদের নখদর্পণে।

পণ্ডিতদের বিশ্বাসকে অবহেলা করছি না। কিন্তু তবু আমি বিশ্বাস করি যে, পণ্ডিতদের জ্ঞান-রাজ্যের বাইরে এখনও এমন সব অজানা, অচেনা দেশ আছে, ভূগোলে যার কথা লেখা হয়নি। এ কথার উত্তরে ইস্কুলের মাস্টারমশাইরা হয়তো আমাকে রুখে বকতে আসবেন—কিন্তু তার আগেই তারা যদি দয়া করে আমার এই আশ্চর্য ইতিহাস শোনেন, তাহলে অত্যন্ত বাধিত হব। মুখের কথায় সত্যকে অস্বীকার করলেও, উড়িয়ে দেওয়া চলে না!

লোকে বাঙালিকে কুনো বলে। আমার মতে, বাঙালি সাধ করে কুনো হয়নি, কুনো হয়েছে—বাধ্য হয়ে। ভারতবর্ষের আর সব জাতি পেটের ধান্দায় যত সহজে দেশ ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে, বাঙালিরা তা পারে না কেন? বাঙালির আত্মসম্মান জ্ঞান বেশি বলে। উড়িয়ারা বিদেশে গিয়ে পালকি বইতে বা মালি কি বেয়ারা হতে একটুও দ্বিধাবোধ করে না। মাড়োয়ারিরা কলকাতায় এসে মাথায় ঘিয়ের মটকা, খাবারের থালা বা কাপড়ের মোট

নিয়ে পথে পথে ফিরি করতে লজ্জা পায় না। ভারতের আরও অনেক বড়ো জাতির লোকেরা ফিজি দ্বীপে, আফ্রিকায় বা দক্ষিণ আমেরিকায় গিয়ে অম্লানবদনে কুলিগিরি করে। এইখানে বাঙালির বাধে। ছোটো কাজে সে নারাজ। অন্য জগতের লোকেরা পরে বড়ো হবার জন্যে আগে ছোটো হতে অস্বীকার করে না, কিন্তু বাঙালি বড়ো হবার লোভেও বিদেশিদের কাছে সহজে মাথা নিচু করতে চায় না। ফিরিওয়ালা হব? কুলিগিরি করব? রামচন্দ্র! এই হল বাঙালিজাতের মনের ভাব। 'মান বাঁচিয়ে বাঙালি কুনো' অপবাদও সইতে রাজি।

তাই আফ্রিকার অনেক জায়গায় গিয়ে ভারতের নানাদেশি লোকদের মধ্যে যখন বাঙালির সংখ্যা দেখলুম খুবই কম, বিশেষ বিস্মিত হলুম না। ভারত থেকে এখানে যারা এসেছে, তাদের অধিকাংশই ভদ্রলোকের কাজ করে না। বাঙালিরা তাদের দলে ভিড়তে চাইবে কেন?

আমিও বাঙালি হয়ে আফ্রিকায় কেন গিয়েছি, এ কথা তোমরা জিজ্ঞাসা করতে পারো। কিন্তু আমার জবাব শুনলে বোধকরি একটু আশ্চর্য হবে। কারণ, আফ্রিকায় চাকরি, কুলিগিরি বা দোকানদারি করতে যাইনি,- আমি গিয়েছিলুম, শিকার করতে।

ভারী আমার শিকারের শখ! অর্থও আছে, অবসরও আছে-কাজেই ভালো করেই শখ মিটিয়ে নিচ্ছি। ভারতের বনে-জঙ্গলে যতরকম পশু আছে, তাদের কোনও নমুনাই সংগ্রহ করতে বাকি রাখিনি। এবারে হিপোপটেমাস, গরিলা আর সিংহেরা আমার বন্দুকের সামনে আত্মদান

করে। ধন্য হতে চায় কি না, তাই জানিবার আগ্রহেই আফ্রিকায় আমার শুভাগমন হয়েছে।

বাংলা দেশ তার বাঘ, হাতি, গোখরো সাপ ও অন্যান্য হিংস্র জন্তুর জন্যে কম বিখ্যাত নয়। পৃথিবীর সব দেশের শিকারির কাছেই আমাদের সুন্দরবন হচ্ছে স্বর্গের মতো। সুন্দরবনের ভিতরে আমিও আমার জীবনের অনেকগুলো দিন কাটিয়ে দিয়েছি সুন্দর ভাবেই। তার অগণ্য জলাভূমি, অসংখ্য নদ-নদী, স্নিগ্ধশ্যাম বনভূমি, নির্জন বালুদ্বীপ, বিজনতার মাধুর্য ও সোঁদা মাটির সুগন্ধ এ জীবনে কোনওকালে ভুলতে পারব না। সেখানে জলের কুমির গাছের অজগরকে দেখতে পেয়ে বিফল আক্রোশে ল্যাজ আছড়ায়, সেখানে নলখাগড়ার বনে বনে হলদে কালো ডোরা কাটা বিদ্যুতের মতো রয়েল বেঙ্গল টাইগার ছুটোছুটি করে, সেখানে স্যাঁতসেঁতে মাটি থেকে বিষাক্ত বাষ্প বা কুয়াশা সুন্দরী গাছের মাথা ছাড়িয়ে উঠে আকাশকে আচ্ছন্ন করে দেয়! সুন্দরবনের ভিতরে আসতে না পারলে যে কোনও শিকারিই তার জীবন ব্যর্থ হল বলে মনে করে।

কিন্তু আফ্রিকার বিপুল অরণ্যও হচ্ছে শিকারির পক্ষে আর এক বিরাট স্বর্গ। সুন্দরবন তার কাছে কত ক্ষুদ্র। পশুরাজ সিংহ, হস্তী, গন্ডার, হিপো, জিরাফ, জেব্রা, চিতা, লেপার্ড, প্যান্থ্যার, গরিলা, বেবুন, শিম্পাঞ্জি, ম্যানড্রিল, বরাহ, নু, উট, উটপাখি, ওকাপি, বনমহিষ, নানাজাতের হরিণ, বানর ও কুমির-আফ্রিকাকে বিশেষ করে মস্ত এক পশুশালা বললেই হয়, এত পশু পৃথিবীর আর কোথাও একত্রে পাওয়া যাবে না।

আফ্রিকার যে তিনটি জীবের সঙ্গে আলাপ করবার জন্যে আমার সবচেয়ে বেশি ঝোক, তারা হচ্ছে-গরিলা, সিংহ ও হিপোপটেমাস।

সভ্যতা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আজকাল আফ্রিকার অত্যন্ত গভীর অরণ্যও মানুষের পক্ষে সুগম হয়েছে। বনের ভিতর দিয়ে ভালো ভালো পথ ও তাদের উপর দিয়ে ছুটছে বড়ো বড়ো মোটরগাড়ি। আগে তিন বছরেও আফ্রিকার যতটা দেখা যেত না, এখন তার চেয়ে বেশি দেখতে গেলেও তিন মাসেই কুলিয়ে যায়। পদে পদে যে অজানা বিপদের আনন্দে আগেকার শিকারিদের জীবন হয়ে উঠত বিচিত্র, স্থলে মোটরের ও জলে কলের নৌকার আবির্ভাবে সে আনন্দ আজ অনেকটা কমে গেছে। আজকাল কেউ কেউ আবার উড়োজাহাজে চড়েও আফ্রিকায় যান 'শিকারি' বলে নাম কেনবার জন্যে। এতে যে শিকারের কী আমোদ আছে, সেটা তারাই জানেন! তার চেয়ে তারা তো পশুশালায় গিয়েও বাঘ, সিংহ, গন্ডার মেরে আসতে পারেন। বিপদহীন শিকার, 'শিকার' নামেরই যোগ্য নয়!

কিন্তু কঙ্গো-প্রদেশের কাবেল নামক জায়গায় এসে এ যুগেও আর মোটরগাড়ির যাত্রী হওয়া যায় না। এখান থেকে আমি কাফ্রি কুলিদের মাথায় মোটঘাট চাপিয়ে, পায়ে হেঁটে গরিলা বা হিপো বা সিংহের কবলে পড়ে এ বিদায়—চিরবিদায় হবারও সম্ভাবনা আছে। যাত্রাপথে পড়ল বুনিয়নি হ্রদ। এ যে কী সুন্দর হ্রদ, ভাষায় বর্ণনা করা যায় না। টলটলে নীল জল, ধারে ধারে জলের ভিতর থেকে জেগে উঠছে শরবন। নীল জলের পটে জীবন্ত আঁক-ছবির মতো বড়ো বড়ো পদ্ম, তাদের গায়ে মাখানো লালাভ

ল্যাভেন্ডারের রং। তেমন বড়ো পদ্ম ভারতে ফোটে না-আকারে তাদের প্রত্যেক মৃণাল দশ ফুটের কম হবে না এবং তা নারকেল দড়ির মতো শক্ত। হ্রদের তীর থেকে উঠেছে তৃণশ্যামল উচ্চভূমি, ইউফোর্বিয়ায় খচিত।

বাংলা দেশের অরণ্য সুন্দর বটে, কিন্তু এমন বিচিত্র নয়। এখানে বনের সঙ্গে সঙ্গে আছে পাহাড়, উপত্যকা, ঝরনা ও হ্রদ, সুন্দরবনে যা নেই। প্রতি পদেই নতুন নতুন দৃশ্য এবং নতুন নতুন বিস্ময়। দিনের পর দিন বনের ভিতর দিয়ে অগ্রসর হচ্ছি, কিন্তু নতুনত্বের পর নতুনত্বের আবির্ভাবে মনের মধ্যে এতটুকু শ্রান্তি আসছে না!

কিন্তু এখানকার সমস্ত সৌন্দর্যের সঙ্গে মেশানো আছে যেন কোনও অভাবিত বিপদের অপচ্ছায়া! মধুর রূপ দেখলেও এখানে কবিত্ব উপভোগ করতে হয়। পরম সাবধানে, কবিত্বে বিহ্বল বা একটু অন্যমনস্ক হলেই সর্বনাশের সম্ভাবনা!

একদিন সন্ধ্যার সময়ে একটা নদীর ধারে আমরা তাঁবু ফেললুম। একে সারাদিনের পরিশ্রমে অত্যন্ত শ্রান্ত হয়েছি, তায় সন্ধ্যার অন্ধকার ঘনিয়ে এসেছে, তাই কোন জায়গায় তাঁবু ফেলা হল সেটা আর লক্ষ করবার অবসর ও উৎসাহ হল না। কিন্তু এইটুকু অসাবধানতার জন্যেই সেদিন যে অঘটন ঘটল, তা ভাবতে আজও আমার গা শিউরে ওঠে!

রাত্রে তাড়াতাড়ি খাওয়াদাওয়া সেরে নিয়ে ক্যাম্পখাটে শুয়ে পড়লুম এবং ঘুম আসতে বিলম্ব হল না। জীবনের অধিকাংশই আমার কেটে

গিয়েছে পথে-বিপথে, তাই যেখানে সেখানে খুশি আমি নিশ্চিন্ত হয়ে ঘুমিয়ে পড়তে পারতুম।

কতক্ষণ ঘুমিয়েছিলুম জানি না, কিন্তু এইটুকু মনে আছে, কী যেন একটা সুখস্বপ্ন দেখতে দেখতে হঠাৎ আমার ঘুম ভেঙে গেল!

ঘুমের ঘোর ভালো করে কাটতে না কাটতে শুনলুম, তাঁবুর বাইরে বিষম একটা হট্টগোল ও হুটোপুটির শব্দ!

ঘুমের ঘোর যখন একেবারে কাটল, সমস্ত গোলমাল তখন থেমে গেছে। তাঁবুর ভিতর ঘুটফুটে অন্ধকার। বসে বসে ভাবতে লাগলুম, গোলমালটা শুনলুম কি স্বপ্নে?

কিন্তু তারপর যা হল সেটা স্বপ্ন নয় নিশ্চয়ই! আমার ডান দিক থেকে খুব জোরে ভোঁস করে একটা আওয়াজ হল!

ঠিক সেই সময়ে আমার বাঁ দিক থেকেও তেমনি ভোঁস করে একটা বেজায় শব্দ উঠল-সঙ্গে সঙ্গে সেদিকেও তাঁবুর গা দুলতে লাগল!

ব্যাপার কী? এ কীসের শব্দ? তাঁবু এমন দোলে কেন? হতভম্ব হয়ে ভাবছি, এমন সময়ে দুই দিক থেকেই আবার দুই-তিন বার তেমনি শব্দ হল ও তাঁবু ঘন ঘন কঁপতে লাগল!

তখনই রাইফেলটা তুলে নিলুম। বাইরে ও কারা এসেছে? এমন শব্দ করে কেন? কী চায় ওরা?...

পরমুহূর্তে কী যে হল কিছুই বুঝতে পারলুম না, —আচম্বিতে যেন ভূমিকম্প উপস্থিত, মাথার উপরে যেন পাহাড় ভেঙে পড়ল! প্রচণ্ড এক ধাক্কায় আমি হাত কয় দূরে মাটির উপরে ছিটকে পড়ে গেলুম।

অন্য কেউ হলে তখনই হয়তো ভয়ে অজ্ঞান হয়ে যেত! কিন্তু বহুকাল আগে থেকেই বিপদের সঙ্গে আমার চেনাশোনা, বহুবারই সামনে দেখেছি সাক্ষাৎ মৃত্যুকে, তাই আহত ও আচ্ছন্ন অবস্থাতেই মাটির উপরে পড়েই আবার সিধে হয়ে উঠে বসলুম!

অস্পষ্ট চাঁদের আলোয় অবাক হয়ে দেখলুম, দূরে সাদা মতো প্রকাণ্ড কী একটা দুম দুম করে চলে যাচ্ছে— অনেকগুলো পায়ের ভারে পৃথিবী কাঁপিয়ে এবং কোথাও আমার তাঁবুর চিহ্নমাত্র নেই!

ফ্যাল ফ্যাল করে ভ্যাবাচ্যাক খেয়ে চারদিকে তাকাতে লাগলুম, কিন্তু এপাশে-ওপাশে, সামনে-পিছনে-আমার তাঁবু নেই কোথাও!

অনেক কষ্টে উঠে খোঁড়াতে খোঁড়াতে কয়েক পা এগিয়ে দেখি, এক জায়গায় কতকগুলো ভাঙা কাঠ ও ছেড়া ন্যাকড়া পড়ে রয়েছে এবং পরীক্ষা করে বোঝা গেল, সেগুলো হচ্ছে আমারই ক্যাম্প খাটের ধ্বংসাবশেষ!

আমার সঙ্গে ছিল ত্রিশজন কুলি ও চাকর-বাকর, কিন্তু তারাও যেন কোনও যাদুমন্ত্রে হাওয়ার সঙ্গে হাওয়া হয়ে মিলে গিয়েছে!

দূরে আবার অনেকগুলো ভারী ভারী পায়ের শব্দ শুনলাম। ফিরে দেখি একদল বড়ো বড়ো জীব আমার দিকেই এগিয়ে আসছে!

ভাগ্যে কাছেই একটা প্রকাণ্ড গাছ ছিল, চটপট তার উপরে উঠে বসলুম। জীবগুলো আর কিছু নয়-একদল হিপো! তারা গদাইলশকরি চালে চলতে চলতে যেখানে আমার তাঁবু ছিল সেইখানে গিয়ে থমকে দাঁড়িয়ে পড়ে, তারপরে প্রত্যেকেই দুই একবার সেই ক্যাম্প খাটের ভগ্নাবশেষকে ভোঁস ভোঁস শব্দে শুকে পরীক্ষা করে, এদিকে ওদিকে সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে তাকায় এবং তারপর নদীর দিকে চলে যায়।

এতক্ষণে ব্যাপারটা স্পষ্ট হল। বন্য পশুদের জলপান করতে যাবার জন্যে এক একটা নির্দিষ্ট রাস্তা থাকে-প্রত্যহই তারা সেই চেনা পথ ব্যবহার করে। এটা হচ্ছে হিপোদের জলপান করতে যাবার রাস্তা। অন্ধকারে ও তাড়াতাড়িতে না দেখে আমরা আস্তানা গেড়েছিলুম হিপোদের এই নিজস্ব রাস্তার উপরেই!

হিপোদের গায়ের জোর ও গোঁয়ারতুমি যেমন বেশি, বুদ্ধিশুদ্ধি তেমনি কম। দুটো হিপো আগে এই পথ দিয়ে যাচ্ছিল। হঠাৎ পথের উপরে তাঁবু দেখে বিস্মিত হয়ে দাঁড়ায় এবং তাদের দেখে পালায় আমার লোকজনরা। তখন তারা দুজনে দু-দিক থেকে ভোঁস ভোঁস শব্দে আমার তাঁবু শুঁকে হিপো বুদ্ধিতে স্থির করে—এটা নিশ্চয়ই কোনও বিপজ্জনক বস্তু বা জন্তু, নইলে কাল এখানে ছিল না, আর আজ কোথা থেকে উড়ে এসে নদীর পথ জুড়ে এমন ভাবে দাঁড়িয়ে থাকবে কেন? অতএব মারো ওটাকে জোরসে এক ঢুঁ!

কিন্তু ঢুঁ মারার সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত তাঁবুটা যেই হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে তাদের সর্বাঙ্গে জড়িয়ে ধরলে, অমনি সমস্ত বীরত্ব ভুলে নাদাপেটা হাঁদারামরা তাঁবু ঘাড়ে করেই অন্ধের মতো দৌড়ে পলায়ন করেছে!

বনের ভিতরে আনাচেকানাচে এমনিধারা কত যে ধারণাতীত বিপদ সর্বদাই অপেক্ষা করে, তা বলবার কথা নয়! একবারমাত্র অসাবধান হলেই জীবনে আর-কখনও সাবধান হবার সময় পাওয়া যাবে না।

ভয়াবহ বিপদে পড়েছিলেন, এখানে সে গল্প বললে অপ্রাসঙ্গিক হবে না। মহিষ শিকারের কথা শুনে কেউ যেন অগ্রাহ্যের হাসি না হাসেন। কারণ বন্যমহিষ বড়ো সহজ জীব নয়, অনেক শিকারির মতে সিংহ ব্যাঘ্রের চেয়েও তারা হচ্ছে বেশি সাংঘাতিক! ঘটনাটি মেজর ডবলিউ রবার্ট ফোরানের 'Kill: or Be Killed' নামে শিকারের প্রসিদ্ধ পুস্তকে প্রকাশিত হয়েছে। এই সত্য গল্পটি গ্রেটেজ সাহেবের মুখেই শ্রবণ করুন, শিকারের এমন ভয়ানক কাহিনি দুর্লভ

আমি তখন রোডেশিয়ার বাংউয়েলো হ্রদে স্টিমারে করে যাচ্ছিলুম। আমার দলে ছিল ফরাসি আলোকশিল্পী অক্টেভ ফিয়ের, কাফ্রি পাচক জেমস ও আর চারজন দেশি চাকর। সেদিন সকালে ডাঙায় নেমে আমরা প্রাতরাশ আহার করছি, হঠাৎ মুখ তুলে দেখেই বিস্ময়ে অবাক হয়ে গেলুম!

আমাদের কাছ থেকে হাত ত্রিশ তফাতেই তিনটে বন্যমহিষ স্থির ভাবে দাঁড়িয়ে আছে! তারা যে সে জীব নয়, এমন বিরাটদেহ মহিষ আমি

জীবনে কখনও দেখিনি! তারা যে ছায়ার মতো নিঃশব্দে কখন সেখানে এসে দাঁড়িয়েছে, আমরা কেউই তা টের পাইনি!

দুই এক মুহূর্তের জন্যে আমরা সকলেই নীরব হয়ে রইলুম। এ নীরবতা যেন মৃত্যুরই অগ্রদূত—জীবন ও পৃথিবী যখন শ্বাস রোধ করে থাকে!

পরমুহূর্তেই আমি আমার 'মসার' রাইফেলটা তুলে নিলুম। এবং আমার দেখাদেখি ফিয়েরও তাই করলে। কারণ এই মহিষ তিনটে যদি আগে থাকতে হঠাৎ আক্রমণ করে তাহলে আমাদের কারুরই আর রক্ষা নেই!

আমি বন্দুক ছুঁড়লুম-গাছের পাখিদের শশব্যস্ত করে আওয়াজ হল ধ্রুম! সবচেয়ে বড়ো মহিষটা ধপাস করে পড়ে গিয়ে যন্ত্রণায় মাথা নাড়া দিলে, তারপর উঠেই ঝোপের ভিতরে অদৃশ্য হয়ে গেল, অন্য দুটোও ছুটিল তার পিছনে পিছনে।

খানিক পরে দেখা গেল, অন্য মহিষদুটো অনেক দূরে নদীর ধার দিয়ে উর্ধ্বশ্বাসে ছুটে পালাচ্ছে। কিন্তু আহত বড়ো মহিষটার আর দেখা নেই।

কোথায় গেল সে? মারাত্মকরূপে জখম হয়ে সে কি ঝোপের ভিতরে কত হয়ে পড়ে আছে?

মাটির উপরে রক্তের দাগ ধরে আমরা খুব সহজেই তার অনুসরণে চললুম, কিন্তু তখন জানতুম না। আমরা চলেছি স্বেচ্ছায় মরণের সন্ধানে!

তাকে ধরা সহজ হল না। আমরা চলেছি তো চলেছিই—সে সুদীর্ঘ রক্তের দাগের যেন শেষ নেই!

ছয় ঘণ্টা কেটে গেল, আমাদের শরীর একেবারে কাবু হয়ে পড়ল। খানিকক্ষণ আর বিশ্রাম না করলেই নয়। একটা গাছের ছায়ায় বসে জিরুতে লাগলুম।

সূর্য অস্ত যাবার কিছু আগে হঠাৎ একজন কুলি এসে খবর দিলে যে, খানিক তফাতেই একটা ঝোপের ভিতরে সেই আহত মহিষটা পড়ে পড়ে ধুঁকছে!

আমরা দুজনে তখনই সোৎসাহে উঠে সেইদিকে ছুটলুম।

কিন্তু সেই ঝোপের কাছে যাওয়া মাত্রই মহিষটা উঠে আগেই আমাদের আক্রমণ করলে। আমরা দুজনেই একসঙ্গে বন্দুক ছুঁড়লুম-মহিষটা আবার চোট খেলে, কিন্তু তবু থামল না।

তার পথ থেকে আমি সরে দাঁড়াতে গেলুম, কিন্তু দৈবগতিকে একটা গাছের শিকড়ে পা আটকে একেবারে ভূতলশায়ী হলুম।

মূর্তিমান যমদূতের মতো মহিষটা আমার উপরে এসে পড়ল এবং আমাকে শিঙে করে টেনে তোলবার চেষ্টা করলে।

আমি কোনওরকমে উঠে দাঁড়িয়ে প্রাণপণে তার শিংদুটো দুহাতে চেপে ধরলুম! আমার হাত ছাড়াবার জন্যে মহিষটা বিষম এক মাথা নাড়া দিলে এবং তার একটা শিং প্রবল বেগে আমার গালের ভিতরে ঢুকে গেল! ভীষণ যন্ত্রণায় আর্তনাদ করে আমি তার শিংদুটো ছেড়ে দিলুম এবং পর

মুহূর্তে অনুভব করলুম। সে আমাকে শূন্যে তুলে ছুঁড়ে দূরে ফেলে দিলে! তারপরে কী হল আর আমি জানি না।

অনেকক্ষণ পরে জ্ঞানলাভ করে দেখলুম, কুলিরা আমাকে নদীর ধারে এনে শুইয়ে দিয়েছে। আমার সর্বাঙ্গে রক্তপ্রবাহ ও অসহ যাতনা। একজন ঠান্ডা জল ঢেলে আমার ক্ষত ধুইয়ে দিচ্ছে।

কোনওরকমে অস্ফুট স্বরে আমি বললুম, আমার বন্ধু কোথায়?

—তাঁকে ধরাধরি করে এখানে নিয়ে আসা হচ্ছে। তিনি বাঁচবেন না।

—মহিষটা?

—মরে গেছে।

কাছেই নদীতে আমাদের মোটর বোট ভাসছিল। আমি বললুম, শি'গগির! ওষুধের বাক্সটা নিয়ে এসো।' আমার মুখের ভিতর থেকে তখন হু হু করে রক্ত বেরিয়ে আসছে! আর-আর, সে কী ভয়ানক যাতনা!

ওষুধের বাক্স এল। একজন কুলি আমার মুখের সামনে আরসি ধরলে। নিজের মুখ নিজে দেখেই আতঙ্কে আমি শিউরে উঠলুম!

আমার ডান গালে এত বড়ো একটা ছ্যাদা হয়েছে যে তার ভিতরে অনায়াসেই হাতের মুঠো ঢুকে যায়! নীচেকার ঠোঁটখানা ছিড়ে কাঁপতে কাঁপতে ঝুলছে। তলাকার চোয়াল দুই জায়গায় ফেটে ও ভেঙে গেছে-কান আর ঠোঁটের কাছে। একখানা লম্বা ভাঙা হাড়ও বেরিয়ে ঝুলে আছে, তার উপরে রয়েছে তিনটে দাঁত! তলাকার চোয়ালের সমস্ত মাংস একেবারে

হাড় থেকে খুলে এসেছে। আমার জিভখানাও টুকরো টুকরো হয়ে গেছে। যতবার থুতু ফেলেছি, ছোটো-বড়ো হাড়ের আর ভাঙা দাঁতের টুকরো ঝরে ঝরে পড়ছে!

সেই অবস্থায় যতটা সম্ভব, নিজের হাতে সূঁচ নিয়ে গাল ও হাড়ের মাংস সেলাই করতে লাগলুম। আজও আমি ভেবে উঠতে পারি না যে, কী করে আমি সেই অসাধ্য সাধন করেছিলুম! যন্ত্রণার উপরে তেমন যন্ত্রণা ভাষায় বর্ণনা করা অসম্ভব!

কোনও রকমে ব্যান্ডেজ বেঁধে ফিয়েরের কাছে গেলুম। তার অবস্থা একেবারেই মারাত্মক। তার দেহের তিন জায়গা শিঙের গুঁতোয় ছিন্নভিন্ন হয়ে গেছে। বাঁ দিকের বুকের সমস্ত মাংসপেশি ছিড়ে ঝল ঝল করে ঝুলছে! তাকে নিয়েও আমি যথাসাধ্য চেষ্টা করলুম, কিন্তু সে বাঁচল না।

চার-পাঁচ দিন পরে অনেক দূর থেকে ডাক্তার আনা হল—এবং তারপরে আবার অস্ত্র চিকিৎসা—আবার নতুন নরকযন্ত্রণা! অনেকদিন ভুগে আমি বেঁচেছি বটে, কিন্তু আমার মুখ হয়েছে চিরকালের জন্যে ভীষণদর্শন!'

আগেই যে মেজর ডবলিউ রবার্ট ফোরানের নাম করা হয়েছে, বন্যমহিষের ভীষণ বিক্রম সম্বন্ধে চিত্তোত্তেজক কাহিনি বলেছেন, এখানে সেটিও তুলে দিলুম। বলা বাহুল্য এটিও সত্য গল্প এবং এরও ঘটনাস্থল আফ্রিকা।

‘একদিন আমার কাফ্রি ভৃত্য হামিসির সঙ্গে আমি জঙ্গলের ভিতর দিয়ে যাচ্ছি, হঠাৎ খানিক তফাত থেকে উত্তেজিত সিংহ ও মহিষের প্রচণ্ড গর্জন ও চিৎকার শুনতে পেলুম!— সঙ্গে সঙ্গে ঘন ঘন লম্ফঝম্পের আওয়াজ!

বুঝলুম নেপথ্যে বিষম এক পশুনাট্যের অভিনয় চলছে, যা স্বচক্ষে দেখবার সুযোগ জীবনে একবারের বেশি আসে না! পা টিপে টিপে অগ্রসর হলুম, পিছনে পিছনে এল হামিসি ।

জঙ্গল থেকে বেরিয়ে একটা খোলা জমির উপর এসে পড়লুম এবং তারপর যে দৃশ্য দেখলুম তা আমার নিজের অস্তিত্ব ভুলিয়ে দিলে—এমনকি আমার বন্দুকের কথাও আর মনে রইল না!

আমার চোখের সামনেই মস্ত একটা কেশরওয়ালা সিংহ এবং বিরাট একটা মহিষ মৃত্যু পণ করে বিষম এক যুদ্ধে নিযুক্ত হয়ে আছে! এ যুদ্ধ একজন না। মরলে থামবে না। হায়রে, আমার সঙ্গে একটা ক্যামেরা যদি থাকত!

আমার এ পথে আসবার কত আগে থেকে এই মহাযুদ্ধ আরম্ভ হয়েছে তা বুঝতে পারলুম না। তবে যুদ্ধ যে এখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে যোদ্ধাদের রক্তাক্ত দেহ দুটো দেখলেই সে প্রমাণ পাওয়া যায়। দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে স্থির নেত্রে তাকিয়ে রইলুম—কিন্তু কতক্ষণ তা জানি না, স্থান ও কালের কথা আমার মন থেকে একেবারে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল।

সিংহটা মহিষের কাঁধের উপর রীতিমতো জাঁকিয়ে বসে আছে এবং মহিষ তার কাঁধ থেকে শত্রুকে ঝেড়ে ফেলবার যতরকম কৌশল জানে কিছুই অবলম্বন করতে ছাড়ছে না! সেই অবস্থাতেই সিংহ তার মাথার গোটাকয়েক প্রচণ্ড ঢুঁ ও নিষ্ঠুর শিঙের গুতো খেলে, কিন্তু তবু সে অটল!

অবশেষে মহিষটা এক ঝটকান মেরে সিংহটাকে মাটির উপরে পেড়ে ফেললে এবং সে সামনে সরে যাবার আগেই তীক্ষ্ণ শিঙের এক গুঁতোয় শত্রুর দেহটা এ ফোঁড় ও ফোঁড় করে দিলে! তারপর সে কী ঝটাপটি, কী গর্জন, চিৎকার! আকাশ বাতাস অরণ্য যেন থর থর করে কাঁপতে লাগিল! আমার মন স্তম্ভিত, আমার মেরুদণ্ড দিয়ে ছুটছে বিদ্যুৎপ্রবাহ!

কোনওরকমে পশুরাজ নিজেকে আবার শত্রুর কবল থেকে মুক্ত করে নিয়ে সরে গিয়ে দাঁড়াল এবং সরে যাবার আগেই দাঁত ও থাবা দিয়ে মহিষের দেহের অবস্থা এমন শোচনীয় করে তুললে যে সে আর বলবার নয়! মহিষের দেহের মাংস ফালা ফালা হয়ে ঝুলতে লাগল! চতুর্দিকে রক্ত ঝরিছে ও ধুলোর মেঘ উড়ছে। দুজনেই পরস্পরের দিকে মুখ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখে মণ্ডলাকারে ঘুরছে আর ঘুরছে! প্রত্যেকেই পরস্পরের উপরে আবার লাফিয়ে পড়বার জন্যে সুযোগ খুঁজছে! তাদের ঘোরা আর শেষ হয় না। তারা নিজেদের ক্ষত আর যন্ত্রণার কথা ভুলে গেল, নিশ্বাসে তাদের নাসারন্ধ্র স্ফীত, এবং মাখ করছে ক্রমাগত শোণিতবৃষ্টি!

আমি ভাবলুম, বিখ্যাত সিংহ বিক্রম এইবারে ঠান্ডা হয়েছে, পশুরাজ এখন ভালোয় ভালোয় সরে পড়বার চেষ্টা করবে! কিন্তু আমার ধারণা ভ্রান্ত! আচম্বিতে ঠিক বিদ্যুতের মতোই আশ্চর্য তীব্র গতিতে সিংহ আবার লাফ মেরে মহিষের স্কন্ধের উপরে উঠে বসল! আমি স্থির করলুম, আর রক্ষা নেই—এবারে মহিষেরই শেষ মুহূর্ত উপস্থিত! পশুরাজ অতঃপর তার ঘাড় কামড়ে ধরবে এবং থাবা দিয়ে তার মাথাটা চেপে ধরে ঘুরিয়ে মুচড়ে দেবে; তারপর ঘাড় ভাঙা মহিষের মৃতদেহ মাটির উপরে লুটিয়ে পড়বে! সিংহরা এই উপায়েই শিকারের পশুদের বধ করে।

মহিষ দুই হাঁটু গেড়ে ভূমিতলে বসে পড়ল এবং সেই অবস্থাতেই শত্রুকে আবার পিঠের উপর থেকে ঝেড়ে ফেলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগল। তারপর চমৎকার বুদ্ধি খাটিয়ে সে টপ করে কাত হয়ে শুয়ে পড়ল এবং তার বিষম ভারী দেহ নিয়ে সিংহের গায়ের উপর দিয়ে গড়িয়ে গেল! তার দেহের চাপে জব্দ হয়ে সিংহ তাকে ছেড়ে দিতে পথ পেলে না! বুঝি তার ঘাড়টাই মটকে গেল!

কিন্তু সিংহ তখনও কাবু হয়নি। মহিষ দু-পায়ে ভর দিয়ে আবার উঠে দাঁড়াতে না দাঁড়াতে সিংহ চড়ে বসল পুনর্বার তার কাঁধের উপরে! এবার সে একপাশ থেকে ঝুলে পড়ে শত্রুর দেহ চার থাবা দিয়ে জড়িয়ে ধরে ভীম বিক্রমে বারংবার দংশন করতে লাগল এবং মহিষটা চিৎকার করে কাঁদতে লাগল কাতর স্বরে!

কিন্তু মহিষ তবু হার মানলে না! বারংবার গা-ঝাড়া দিয়েও যখন সে ছাড়ান পেলে না, তখন সে শেষ উপায় অবলম্বন করলে। হঠাৎ শরীরের সমস্ত শক্তি একত্র করে মহিষ উলটে চিত হয়ে মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ল এবং তার বিপুল ও গুরুভার দেহের তলায় পশুরাজের দেহ গেল অদৃশ্য হয়ে!

মাটি তখন রক্তে রাঙা এবং সমস্ত জায়গাটার উপর দিয়ে যেন ঝড় বয়ে গেছে! সিংহ ও মহিষ-কেউ আর নড়ছে না, যেন তারা কেউ আর বেঁচে নেই! আমি অবাক হয়ে ভাবতে লাগলুম, পরিণামে কী হবে? একবার পিছন ফিরে হামিসির দিকে তাকালুম—তার মুখ দিয়ে বইছে দর দর ধারে ঘামের ধারা, দুই স্থির চক্ষু বিস্ময়ে বিস্ফারিত, দুই ঠোঁট ফাঁক করা, যেন সে মায়ামন্ত্রে সম্মোহিত! আবার ঘটনাস্থলের দিকে দৃষ্টি ফেরালুম।

ধীরে ধীরে টলতে টলতে মহিষ আবার উঠে দাঁড়াল, এবং হেঁটমুখে শত্রুর দিকে দৃষ্টিপাত করলে!

সিংহের সর্বাঙ্গ তখন থেতলে তালগোল পাকিয়ে গেছে, কিন্তু তখনও সে মরেনি। মহিষ শিং নেড়ে আবার তাকে দুই-তিন বার গুতো মারলে, সঙ্গে সঙ্গে পশুরাজের প্রাণ বেরিয়ে গেল!

যুদ্ধক্ষেত্র একেবারে স্তব্ধ; কাছের কোনও গাছে একটা পাখি পর্যন্ত ডাকছে না! আমি কেবল আমার দ্রুতচালিত হৃৎপিণ্ডের শব্দ শুনতে পেলুম!

মহিষ তখন খুব জোরে জোরে নিশ্বাস টানছে এবং তার দেহ টলমল করে টলছে! সেই অবস্থায় বিজয়ী বীর মৃত্যুকে বরণ করলে! তার দেহ সশব্দে পরাজিত শত্রুর মৃতদেহের উপরে লুটিয়ে পড়ল!

আমাদের তখন আর কথা বলবার শক্তিও ছিল না। অভিভূত প্রাণে বিজেতা ও বিজিতের দেহ সেই নির্জন অরণ্যের মধ্যে ফেলে রেখে আমরা দুজনে পায়ে পায়ে চলে এলুম।

পশুদেহ হলেও সম্মুখ যুদ্ধে মৃত সেই দেহ দুটিতে হাত দেওয়া অধর্ম!

রাতের অতিথি

সিংহের চেয়ে গরিলা বধ করবার জন্যেই আমার ঝোঁক ছিল বেশি! আফ্রিকার বনে বনে সিংহের অভাব নেই, তাদের দলে দলে বধ করেছে এমন লোকও অসংখ্য। কিন্তু গরিলা হচ্ছে দুর্লভ জীব। পৃথিবীর খুব কম চিড়িয়াখানায় গরিলা দেখতে পাওয়া যায়। আফ্রিকাতেও গরিলার সংখ্যা খুব কম। তার উপরে দৈহিক শক্তিতে ও মানসিক বুদ্ধিতে তারা পশুরাজ্যে অতুলনীয় বলে অধিকাংশ শিকারি তাদের কাছে ঘেঁষতেও ভরসা পায় না।

কিভুর অরণ্য হচ্ছে গরিলাদের রাজত্ব আমি এখন সদলবলে এইখানেই এসে হাজির হয়েছি।

একটি ছোটো খাত দিয়ে জলের ধারা বয়ে যাচ্ছে, স্থানীয় ভাষায় তাকে ‘কানিয়ানামা গুফা’ বা ‘মৃত্যু-খ্যাত’ বলে ডাকা হয়। এর এমন ভয়ানক নাম কেন তা পরীক্ষা করবার সুযোগ পাইনি। এরই আশেপাশে রয়েছে প্রকাণ্ড বাঁশবন-এখানকার ভাষায় যাকে বলে ‘রুগানো’। এইখানেই সর্বপ্রথমে আমি গরিলার পদচিহ্ন দেখতে পেলুম।

কচি বাঁশের রসালো অঙ্কুর হচ্ছে গরিলার শখের খাবার। এখানে বন বলতেও বুঝায় প্রধানত বাঁশের বন। মাইলের পর মাইল চলে গেছে কেবল বাঁশবনের পর বাঁশবন এবং তাদের ভিতর থেকে মেঘ ছোঁয়া মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে মিকেনো, কারিসিম্বি ও বাইশোক নামে তিনটি আগ্নেয়গিরি। ওই সব পাহাড়ের দুর্গম স্থানগুলিও বাঁশবনের অধিকারভুক্ত হয়েছে। সেখানে বাঁশের ঝাড় এত ঘন যে, গাছ না কেটে কিংবা হামাগুড়ি না দিয়ে তার ভিতরে ঢোকা বা নড়াচড়া করা যায় না। বাঁশবনের কাছে কাছে নীচে রয়েছে জলবিছুটি গাছ লালাভ সাদা ফুসিয়া জাতীয় পুষ্পগুল্ম, অজস্র ফুলে ভরা দোপাটি গাছ, শ্বেতবর্ণ ভেরোনিক গুল্ম এবং বেগুনি, হলদে ও আলতা রঙা রাশি রাশি অর্কিড!

এইসব বনে বেড়িয়ে বেড়ায় দলে দলে গরিলা, মহিষ ও হস্তী। চিতাবাঘ ও অন্যান্য হিংস্রজন্তুর অভাবও এখানে নেই। এক বনের কচি বাঁশ সাবাড়ি হয়ে গেলেই গরিলারা অন্য

নয়, তাই উদর চিন্তায় তাদের ব্যতিব্যস্ত হতেও হয় না, খাবার কেনবার জন্যে পয়সা রোজগার করতেও হয় না! বনে গাছ আছে, ভেঙে

খাও; নদীতে জল আছে, চুমুক দাও! তারপর গাছের ডাল পাতা ভেঙে নরম বিছানা তৈরি করো, এবং ঘুমিয়ে লুমিয়ে দিব্যি আমামে জোরসে নাক ডাকাও! গরিলারা কী সুখেই আছে!

কিভু-অরণ্যে দু-রকম গাছ বিশেষ ভাবে দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একরকম গাছের নাম দেশি ভাষায় 'মুসুঙ্গুরা'। তার পাতাগুলি খুব ছোটো এবং তাতে গোলাপের মতন দেখতে হলদে। হলদে ফুল ফোটে। লম্বায় পঞ্চাশ-যাট ফুট উঁচু হয়! আর একরকম গাছের নাম 'মুগোসী'। তার পাতা আখরোট পাতার মতন এবং তার উচ্চতা একশো ফুট পর্যন্ত হয়। মার্চ ও এপ্রিল মাসে তাতে ম্যাজেন্টার আভা মাখানো বেগুনি রঙের থোলো থোলো ফুল ফোটে। পূর্বোক্ত দুই গাছের উপরেই সবুজ ও সোনালি রঙের শৈবালের বিছানা পেতে জেগে থাকে সব রঙিন ও বিচিত্র অর্কিডরা! এখানে আরও যে কতরকম বাহারি ফুল দেখলুম তা আর বলা যায় না! এ যেন ফুলের দেশ!

কিন্তু এই ফুলের দেশেই আমি ঘুরে বেড়াচ্ছি কবিতার খাতা নিয়ে নয়, হত্যাকারী বন্দুক ঘাড়ে করে!

গরিলা শিকারের একটা মস্ত সুবিধা আছে। অনেক খুঁজে কষ্ট পেয়ে তবে সিংহ বা বাঘের পাত্তা মেলে। কিন্তু একবার গরিলাদের দেশে আসতে পারলে তাদের দর্শন পেতে বেশি দেরি হয় না। তার কারণ, তারা থাকে দলবদ্ধ হয়ে। একে তো তাদের প্রত্যেকের গায়ে অসুরের মতন জোর, সিংহও জোরে তাদের সঙ্গে এঁটে উঠতে পারে কি না সন্দেহ, তার উপরে

তারা যখন দল বেঁধে থাকে, তখন হাতি পর্যন্ত গরিলাদের কাছে তুচ্ছ বলে গণ্য হয়! তারা নিজেদের এই প্রতাপ ভালো করেই জানে, তাই কোনও শত্রু বোকার মতন কাছে এসে উঁকিঝুঁকি মারলে সেটার দিকে ভ্রূক্ষেপ মাত্র করে না! সিংহ বা মানুষ দেখলে প্রথমে তারা অবহেলা প্রকাশ করে, কাছে এগিয়ে এলে মুখ খিচিয়ে দু-চার বার ধমক দেয়, কিন্তু যে শত্রু তাতেও সাবধান না হয়, তার কপাল বড়ো মন্দা! গরিলা চলে-ফেরে। গদাইলশকরি চালে ধীরে ধীরে, এমনকি খুব বেশি বিপদে না পড়লে দৌড়াদৌড়ি করে শরীরকে সে ব্যস্ত করতে চায় না। এইসব কারণে গরিলার পিছু নেওয়া অনেকটা সহজ।

গরিলাদের সন্ধানে কিছু অরণ্যে এসে এক জাতের মানুষ দেখে অবাক হয়েছি। ইংরেজিতে এদের নাম 'পিগমি', আমি বালখিল্য বলতে চাই। পৃথিবীতে এই বালখিল্যদের চেয়ে ছোটো আকারের মানুষ আর চোখে পড়ে না, মাথায় এরা আমার কোমরের চেয়ে উঁচু নয়। দূর থেকে এই বালখিল্যদের দেখলে মনে হয়, যেন একদল নয়-দশ বছরের ছেলেমেয়ে দাঁড়িয়ে আছে!

বালখিল্যদের রং কুচকুচে কালো, চুল কোঁকড়া, নাক থ্যাবড়া, কোমরে খালি তেলেচোবানো একটুকরো ন্যাকড়া ঝোলে। ছোটো চেহারা হলেও এদের দেহ খুব বলিষ্ঠ, সুদৃঢ় মাংসপেশিগুলো দেহের উপরে ফুলে ফুলে ওঠে। এবং এরা পরম সাহসী। নিজেদের দেহের মতনই ছোটো ছোটো বর্শা নিয়ে এরা গভীর জঙ্গলে শিকার করতে ঢোকে ও বড়ো বড়ো

হাতি আর বন্যমহিষ বধ করে! শিকারই এদের একমাত্র জীবিকা। শাকসবজি, শিকড় খেয়েই এরা দিন কাটাতে পারে, যখন মাংস খাবার সাধ হয় তখন তির ধনুক বা বর্শা নিয়ে বনে গিয়ে শূকর বা হরিণ মেরে আনে। বালখিল্যরা আফ্রিকার অন্য কোনও বাসিন্দাদের সঙ্গে মেলামেশা করে না। সবুজ বনের ভিতরে নৃত্যশীলা নদীর তীরে ছোট ছোট পাতার কুঁড়ে বানিয়ে পরম শান্তিতে তারা সরল জীবন কাটিয়ে দেয় এবং সভ্যতার কোনও ধারই ধারে না।

একদিন পথ চলতে চলতে হঠাৎ দেখলুম, এক জায়গায় বড়ো বড়ো গাছের তলায় মাটির উপরে পর পর অনেকগুলো বাসা সাজানো রয়েছে। গুনে দেখলুম, ত্রিশটা বাসা। লতা, ডাল ও শুকনো পাতা দিয়ে প্রত্যেকটি বাসা তৈরি।

জিজ্ঞাসা করাতে আমার কুলিদের সর্দার জানালে, এগুলো গরিলাদের বাসা।

আমি বললুম, শুনেছি গরিলারা এক বাসায় দুদিন শোয় না?

সে জানালে, —না, তবে তারা নিশ্চয়ই খুব কাছে আছে। কারণ এ বাসাগুলো টাটকা। চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম। বাঁশবন ও অন্যান্য নানা জাতের গাছের স্নিগ্ধ ছায়া নরম ঘাসের বিছানার উপরে ঝিলমিল করছে। গাছের ডালে ডালে দাঁড়কাক, কাঠঠোকরা, ঘুঘু, মধুপায়ী সূর্যপাখি ও একরকম গীতকারী চড়াইপাখি বন-মর্মরের সঙ্গে নিজেদের কণ্ঠ মিশিয়ে দিয়ে মিশ্রসঙ্গীত সৃষ্টি করেছে। উঁচু গাছের ঘন পাতার পর্দা সরিয়ে মাঝে

মাঝে মুখ বাড়িয়েই পালিয়ে যাচ্ছে সোনালি বানররা। একপাশ দিয়ে ছোট্ট একটি নদী রুপোর লহর দুলিয়ে এঁকেবেঁকে চোখের আড়ালে চলে গেছে।

সূর্য অস্ত যেতে দেরি নেই। দূর থেকে একটা শব্দ কানে এল—কারা যেন মড়মড় করে গাছ ভাঙছে!

কুলির সর্দারের দিকে ফিরে জিজ্ঞাসা করলুম, কারা গাছ ভাঙছে?

—গরিলারা।

আমি বললুম, তাহলে এইখানেই ছাউনি ফ্যালো। জায়গাটি আমার ভালো লাগছে। কাল আমরা গরিলা শিকারে যাব।

কিন্তু সেই রাত্রেই আমার জ্বর এল—পরদিন আর শিকারে যাওয়া হল না। পাঁচ দিন জ্বরে ভুগে উপোস করে এমন দুর্বল হয়ে পড়লুম যে, আরও দিন তিনেক সেইখানেই বিশ্রাম করতে হল।

ইতিমধ্যে এক আশ্চর্য কাণ্ড ঘটল।

সেদিন সকালে সবে আমি পথ্য করেছি, শরীর বড়ো দুর্বল। সঙ্গে করে রবীন্দ্রনাথের কাব্যগ্রন্থাবলী নিয়ে গিয়েছিলুম, মাঝে মাঝে তার পাতা ওলটাই এবং মাঝে মাঝে তাঁবুর বাইরে গিয়ে একখানা ক্যাম্পচেয়ার পেতে বসি। নদীর নাচ দেখি আর পাখিদের গান শুনি। এমনি ভাবে সারাদিন কাটল। সন্ধ্যার কিছু আগে একদল হাতি বনের ভিতরে মহা শোরগোল তুলে মড়মড়িয়ে গাছ ভাঙতে ভাঙতে খানিক তফাত দিয়ে চলে গেল—তারা আমাদের দিকে চেয়েও দেখলে না। এসব দৃশ্য এখন আমার চোখেও সহজ হয়ে এসেছে। হাতির পাল কেন, বনের ভিতর দিয়ে যেতে যেতে মাঝে

মাঝে দূরে সিংহদেরও খেলা করতে দেখেছি এবং তারাও আমাদের দিকে বিশেষ দৃষ্টিও দেয়নি বা আক্রমণ করতেও আসেনি।

সন্ধ্যার অন্ধকার যখন ঘনিয়ে এল, পাখিদের কনসার্ট ধীরে ধীরে ক্ষীণ হয়ে থেমে গেল। স্তব্ধ অরণ্যের অন্তঃপুর থেকে একটা চিতাবাঘের গলা জেগে উঠল। আমিও আস্তে আস্তে তাঁবুর ভিতরে এসে ঢুকলুম।

সেদিন গুরুপাক খাবার সইবে না বলে দুটুকরো রুটি জেলি মাখিয়ে খেয়ে শুয়ে পড়লুম।

আফ্রিকার বনের পাখিরা ভালো করে আলো ফোটবার আগেই এত বেশি চ্যাঁচামেচি শুরু করে যে, ভোর হতে না হতেই ঘুম ভেঙে গেল।

অত্যন্ত ক্ষুধাবোধ করলুম। চাকর-বাকররা তখনও জাগেনি, কাজেই নিজেই উঠে কিঞ্চিৎ খাদ্যসংগ্রহের চেষ্টা করলুম।

প্রথমেই আবিষ্কার করলুম, আমার জেলির টিনটা টেবিলের উপর থেকে অদৃশ্য হয়েছে। তারপর দেখলুম, কাল যে চারখানা রুটি আমি না খেয়েই শুয়ে পড়েছিলুম, টেবিলের উপরে সেগুলোও নেই!

অত্যন্ত রাগ হল। নিশ্চয়ই কোনও চোর ও পেটুক কুলি কাল রাত্রে লুকিয়ে আমার তাঁবুর ভিতরে ঢুকেছিল ভেবে সর্দারকে ডাকলুম।

সব কথা শুনে সর্দার অন্যান্য কুলিদের আহ্বান করলে। কিন্তু তাদের কেউ দোষ স্বীকার করলে না।

আমি ক্রুদ্ধ স্বরে বললুম, আচ্ছা, ভবিষ্যতে আমার তাঁবুর ভিতরে যদি কোনও চোরকে ধরতে পারি, তাহলে গুলি করে তাকে মেরে ফেলব!

সেদিন রাত্রে হঠাৎ ঝমঝম করে বৃষ্টি নামল। ঘুমোবার সময়ে আমার বৃষ্টি ভারী মিষ্টি লাগে। পৃথিবী যখন ধারাজলে স্নান করছে, মাটি যখন কাদায় প্যাচ প্যাচ করছে এবং পথিকদের কাপড়-চোপড় যখন ভিজে স্যাৎ স্যাৎ করছে, আমি যে তখন দিব্যি শুকনো ও উত্তপ্ত দেহে পরম আরামে বিছানায় শুয়ে আছি, এই পরিতৃপ্তির ভাবটুকু মনকে খুশি করে তোলে এবং চোখে তন্দ্রাসুখের আবেশ মাখিয়ে দেয়! গাছের পাতায় পাতায় বৃষ্টিবিন্দুর টুপুর টুপুর শব্দ শুনতে শুনতে আমি ঘুমিয়ে পড়লুম।

পরদিন সকালে উঠে দেখা গেল, বিস্কুটের যে নতুন টিনটা সবে কাল সন্ধ্যায় খোলা হয়েছিল, সেটা আর টেবিলের উপরে নেই!

বিশেষ ভাবনা হয় না। কিন্তু সভ্যতা ও হাটবাজার থেকে এত দূরে এই গহন বনে যেখানে একটা মোহর দিলেও একখানা বিস্কুট কেনা যায় না, সেখানে নিত্য যদি এইভাবে খাবার চুরি যেতে থাকে তাহলে দু-দিন পরেই আমাকে যে পাততাড়ি গুটিয়ে মানে এখান থেকে সরে পড়তে হবে।

তাঁবুর বাইরে গিয়ে দাঁড়ালুম। সঙ্গে সঙ্গে চোখ পড়ল মাটির উপরে। কাল রাত্রে বৃষ্টি পড়ে তাঁবুর দরজার সামনেকার মাটি নরম করে দিয়েছে এবং সেইখানে কতকগুলো স্পষ্ট পায়ের দাগ। সে পদচিহ্ন মানুষের।

সেদিনও আগে সর্দারকে ডেকে চুরির কথা বললুম ও পায়ের দাগগুলো দেখালুম।

সর্দার খানিকক্ষণ ধরে দাগগুলো পরীক্ষা করলে। আফ্রিকার বনে বনে ঘোরা যাদের ব্যবসা, ভূমিতলে পদচিহ্ন দেখে ভালো ডিটেকটিভের

মতন তারাও যে অনেক তথ্য আবিষ্কার করতে পারে, এ আমি জানতুম। সুতরাং এই পদচিহ্নগুলো দেখে সর্দার কী বলে তা শোনবার জন্যে সংগ্রহে অপেক্ষা করতে লাগলুম।

সর্দার হামাগুড়ি দিয়ে ঘুরে ঘুরে দাগগুলো পরীক্ষা করতে লাগল। লক্ষ করলুম, তার মুখে চোখে বিস্ময়ের আভাস ফুটে উঠেছে! সর্দারের পরীক্ষা যখন শেষ হল তার মুখ তখন গম্ভীর।

—কী সর্দার, ব্যাপার কী?

সর্দার হতাশভাবে কেবল দুবার মাথা নাড়লে।

—কিছু বুঝতে পারলে না? কিন্তু আমি বলছি, এগুলো মানুষের পায়ের দাগ। আর এ দাগগুলো যার পায়ের, সে নিশ্চয়ই কুলিদের দলে আছে। আমরা শেষ গ্রাম থেকে বিশ মাইল দূরে এসে পড়েছি। রাত্রে এই বিপজ্জনক বন পার হয়ে সেখান থেকে কোনও চোর আসতে পারে না, এ কথা তুমি মানো তো?”

—হ্যাঁ হুজুর, মানি।

—তাহলে আমাদেরই কোনও কুলি এই চুরি করেছে।

সর্দার আবার প্রবল ভাবে মাথা নাড়া দিয়ে বললে, না হুজুর, আমাদের কোনও কুলিই এ চুরি করেনি।

—সর্দার, তাহলে তুমি কী বলতে চাও শুনি?

—হুজুর, আমি যা বলতে চাই, তা শুনলে হয়তো আপনি বিশ্বাস করবেন না।

—কেন?

—আপনি ভাববেন আমি অসম্ভব মিথ্যাকথা বলছি!

—আচ্ছা, তোমার কী বিশ্বাস বলে। আমি বিশ্বাস করব।

—হুজুর, কাল রাতে আপনার তাঁবুতে যে চুরি করতে ঢুকেছিল, সে পুরুষমানুষ নয়।

—তার মানে?

—অন্তত এই পায়ের দাগগুলো যে স্ত্রীলোকের, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই!

—সর্দার, সর্দার! তোমার কি মাথা খারাপ হয়ে গেছে? যে বন গ্রাম থেকে বিশ মাইল দূরে, যে বনে গরিলা, হাতি, বুনোমোষ আর বাঘের বাস, সেখানে রাত্রে চুরি করতে আসবে স্ত্রীলোক?

সর্দার দৃঢ়ভাবে বললে, ওসব কথা আমিও ভেবে দেখেছি। কিন্তু এগুলো স্ত্রীলোকের পায়ের দাগ।

আমি স্তম্ভিত ও স্তব্ধ হয়ে রইলুম। তারপর সর্দার চলে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি তাকে ডেকে বললুম, শোনো। এসব কথা যেন কুলিদের কাছে জানিও না!

সর্দার অল্প হেসে বললে, আপনি মানা না করলেও আমি বলতুম না। এ গল্প শুনলে তারা পোতনির ভয়ে এখনই আমাদের ছেড়ে পালিয়ে যাবে!

সর্দারের কথা নিয়ে যতই নাড়াচাড়া করি, কিছুতেই বিশ্বাস করতে পারি না। ভয়াবহ কিভু-অরণ্য, যার চতুঃসীমানায় লোকালয় নেই, যার ভিতর দিয়ে দিনের বেলায় পথিকরা দলবদ্ধ ও সশস্ত্র হয়েও সভয়ে পথ চলে, মানুষের জীবন যেখানে প্রতিমুহূর্তেই হিংস্র জন্তুর দুঃস্বপ্ন দেখে, সেখানে গভীর রাত্রে একাকিনী স্ত্রীলোক,-এ কল্পনা হাস্যকর! সর্দার নিশ্চয়ই ভুল করেছে!

দুপুরবেলায় একটা বন্দুক নিয়ে বাইরে গেলুম। কাছাকাছি যদি কোথাও দুই একটা শিকারের পাখি পাওয়া যায় তাহলে আজকের নৈশ আহারটা সুসম্পন্ন হবে, এই ভেবে নদীর ধার ধরে গাছে গাছে তীক্ষ্ণদৃষ্টি রেখে অগ্রসর হলুম।

নদীর জলধারায় ঝরে ঝরে পড়ছে উজ্জ্বল রৌদ্রধারা এবং তার সঙ্গে বাতাসে বাতাসে বয়ে যাচ্ছে শত শত পাখির গানের আনন্দ-ধারা! চারদিকের জীবন্ত স্নিগ্ধতাটুকু আমার এত ভালো লাগল যে, জীবহিংসা করতে আর সাধ হল না। বড়ো জাতের একরকম বন্যপায়রা আমায় দেখে কাছের গাছ থেকে দূরের গাছে উড়ে গিয়ে বসল, কিন্তু আমি তাকে অনুসরণ করলুম না। মন যেন আমাকে ডাক দিয়ে বললে, —আজকের এই উত্তপ্ত সূর্যালোকের আনন্দ সভায় তোমাদের যতটুকু বাঁচবার অধিকার, ওরও অধিকার তার চেয়ে একটুও কম নয়।

খানিকক্ষণ ঘোরাঘুরি করে আবার তাঁবুর দিকে ফিরলুম।

হঠাৎ নদীর তীরে কী একটা চকচকে জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে, সূর্যালোক তার উপরে পড়ে জ্বলে জ্বলে উঠছে!

কয়েক পা এগিয়ে গিয়ে দেখি, আমার বিস্কুটের টিনটা সেখানে উপুড় হয়ে পড়ে রয়েছে!

তাড়াতাড়ি সেটা তুলে নিলুম। টিন একেবারে খালি!

নদী তীরের বালির উপরে মানুষের পায়ের অনেকগুলো দাগ!

যে আমার টিন চুরি করেছে, সে লোকালয়ে ফিয়ে যায়নি, বৃষ্টিসিক্ত গভীর রাত্রে, এই ভীতসঙ্কুল বন্য নদীর তীরে বসে জমাট অন্ধকারে নির্ভয়ে নিশ্চিন্ত প্রাণে উদরের ক্ষুধানিবৃত্তি করেছে। কে সে? সে যে আমার কোনও কুলি নয় বা স্ত্রীলোক নয়, এটা ঠিক! কিন্তু পুরুষ হলেও সে কী রকম পুরুষ? তার কি কোনও মাথা গোঁজবার আশ্রয়ও নেই? তার মনে কি মানুষের স্বাভাবিক ভয়ও নেই?

এমনি সব কথা ভাবতে ভাবতে ছাউনিতে ফিরে এসে দেখি, সর্দার একটা গাছতলায় চুপ করে বসে আছে।

তাকে আমার নতুন আবিষ্কারের কথা জানালুম। শুনে তার মুখে নতুন কোনও বিস্ময়ের চিহ্ন ফুটে উঠল না! সে আবার খালি হতাশ ভাবে মাথা নাড়লে।

তার ব্যবহার রহস্যজনক। যেন সে কোনও গুপ্তকথা জানতে পেরেছে, কিন্তু আমার কাছে প্রকাশ করতে চায় না!

আমিও জানবার জন্যে আগ্রহ প্রকাশ করলুম না। তার মনে একটা ভ্রমাত্মক বিশ্বাস জন্মেছে, হয়তো আবার একটা কোনও উদ্ভট কথা বলে বসবে!

কেবল বললুম, সর্দার, এই অদ্ভুত চোরকে ধরতে হবেই। আজ রাত্রে আমি ঘুমব না, তুমি জেগে সতর্ক হয়ে থাকতে পারবে কি?

সর্দার বললে, আমি স্থির করেছি, আজ রাত্রে এই গাছের উপরে উঠে পাহারা দেব।

আমি তাকে ধন্যবাদ দিলুম।

সে রাত্রে আহারাদির পর আলো নিবিয়ে আমি শুয়ে পড়লুম। কিন্তু ঘুমলুম না। শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, আজ রাত্রে মেঘ ও বৃষ্টি নেই, চাঁদের আলো আছে—আর বাইরের গাছের টাঙে জেগে আছে সতর্ক সর্দার। চোরকে সে অনায়াসেই দেখতে পাবে! আর বিছানায় শুয়ে জেগে আছি। আমি-চোরকে অনায়াসেই ধরতে পারব।

বাইরে নিশুত রাতের বুকে দুলছে আর দুলছে একতালে ঝিল্লির ঝঙ্কার! মাঝে মাঝে দূর বন থেকে ভেসে ভেসে আসছে হস্তীর চিৎকার! আমার তাঁবুর উপর থেকেও দু-তিন বার একটা প্যাঁচা ডাক দিয়ে যেন বলে বলে গেল-হাঁশিয়ার, হাঁশিয়ার!

আমি হাঁশিয়ার হয়েই রইলুম। বাইরের চোখ বুজে শুয়ে আছি বটে, কিন্তু মনের চোখ খোলা আছে! তন্দ্রা অনেকবারই সোহাগ করে আমাকে

ঘুম পাড়াতে এসেছিল, কিন্তু আজ আর তার কোনও জারিজুরিই খাটল না! আমি জোর করে সারা রাত জেগে রইলুম!

তাঁবুর ফাঁক দিয়ে ভোরের আলো এলো, কিন্তু রাত্রের চোর এলো না! পাখিদের সমবেত চিৎকার শুনে মনে হল, আমার ব্যর্থতা দেখে তারা যেন আমাকে টিটকারি দিচ্ছে!

সর্দার কাছের একটা বাঁশঝাড়ের পাশে দাঁড়িয়েছিল। আমাকে দেখে এগিয়ে এসে সেলাম করলে ।

আমি তিক্ত স্বরে বললুম, সারারাত জেগে থাকাই সার হল। বদমাইস চোরটা কাল আসেনি।

সর্দার বললে, সে এসেছিল।

—এসেছিল!

—হাঁ হুজুর, ওই বাঁশঝাড়ের মধ্যে!

—ওর ভিতর দিয়ে রাত্রে বা দিনে কোনও মানুষ আসতে পারে না।

—হুজুর, তাকে মানুষ মনে করছেন কেন?

—কী সর্দার, তুমিও কি তাকে পেতনি বলে ভাবো?

আমি তাকে কী মনে করি, আল্লাই তা জানেন! কিন্তু সে ওই বাঁশঝাড়ের মধ্যে এসেছিল, আমি কাল রাতে ওইখানে শুকনো পাতায় পায়ের শব্দ শুনেছি। আজ এখনই ওই জায়গাটা আমি পরীক্ষা করে আসছি। বাঁশঝাড়ের তলাকার জমি এখনও পরশু রাতের বৃষ্টিতে নরম হয়ে আছে। ওই জমিতে আমি হাঁটু আর হাতের ছাপ দেখেছি। সে হামাগুড়ি দিয়ে

বাঁশঝাড়ের তলা দিয়ে আসছিল। কিন্তু তার চোখ আমাদের চেয়ে ঢের বেশি তীক্ষ্ণ, সে চোখ তো এখন আর মানুষের চোখ নয়! গাছের উপরে আমাকে সে নিশ্চয় দেখে ফেলেছে। তারপর আর কী সে বাঁশঝাড় ছেড়ে বাইরে বেরোয়?

রুদ্ধ আক্রোশে আমি স্তব্ধ হয়ে রইলুম। সর্দার আবার শুধোলে, হুজুর, আমাদের তাঁবু তুলে এখান থেকে আজ রওনা হবার কথা। কখন যাবেন?

আমি দৃঢ়স্বরে বললুম, আগে ওই চোরকে ধরব, তবে এখান থেকে এক পা নড়ব! যদি এক মাস এখানে থাকতে হয়, তাও থাকব! সর্দার, আজ তোমার তাঁবুটা আমার তাঁবুর পাশে এনে খাটিয়ে ফ্যালো। আজ রাত্রে তুমি আর গাছে চোড়ো না, নিজের তাঁবুর ভিতরে জেগে বসে থেকে। আমার তাঁবুতে আমিও জেগে থাকব। আমার ডাক শুনলেই তুমি বেরিয়ে এসো।

সর্দার ঘাড় নেড়ে জানালে, আচ্ছা।

সে রাতেও আবার জাগবারা পালা। আকাশে চাঁদ জাগছে, বনে রক্তপিপাসা জাগছে, তাঁবুতে আমার চোখ জগছে, বাঁশঝাড়ে চোর জাগছে! আর জাগছে নদী-যেন ঘুমপাড়ানি গান শানাতে শোনাতে!

সর্দার বলে কী? —‘তাকে মানুষ মনে করছেন কেন?’ সে মানুষ নয়! সর্দারের মনে কুসংস্কারের উদয় হয়েছে? আশ্চর্য কী, সে-ও তো আফ্রিকারই লোক! এই আফ্রিকা হচ্ছে বিশ্বের সমস্ত কুসংস্কারের স্বদেশ!

এখানে আকাশে বাতাসে জলে স্থলে ঘুরে বেড়ায় শুধু ভূত আর পেতনি! যে নরখাদক জন্তু বেশি মানুষ মারে, সে আর এখানে সাধারণ জন্তু থাকে না, লোকে বলে-দুষ্ট মানুষই নাকি ঝাড়ফুঁক, তুকতাকের গুণে জন্তুর দেহ ধরে নরনারীর ঘাড় ভাঙছে! তাই এদেশে ভূতের চেয়ে রোজার দল ভারী!

কাল সারা রাত কেটেছে অনিদ্রায়, আজও রাত দুপুর হয়ে গেছে। এইসব ভাবতে ভাবতে কখন যে তন্দ্রার আমেজ এসেছে বুঝতে পারিনি। হঠাৎ তাঁবুর ভিতরে খটমট করে জিনিস নড়ার আওয়াজ হল এবং সঙ্গে সঙ্গে চট করে আমার তন্দ্রার ঘোর কেটে গেল! ঘরের ভিতরে কেউ এসেছে! ঘুটফুটে অন্ধকারে তাকে দেখা যাচ্ছে না বটে, কিন্তু বিষম একটা পূতিগন্ধে চারিদিক বিষাক্ত হয়ে উঠেছে! মানুষের গা দিয়ে এ রকম দুর্গন্ধ বেরোয় না!

আমি শ্বাস রোধ করে পাথরের মতন স্থির ভাবে শুয়ে রইলুম। যে ঘরের ভিতরে এসে ঢুকেছে সেও নিসাড়,-তন্দ্রা ছুটে যাবার সময়ে হয়তো আমি সামান্য চমকে উঠেছিলুম, হয়তো সে দাঁড়িয়ে আমাকে তীক্ষ্ণনেত্রে পরীক্ষা করছে, হয়তো সে অন্ধকারেও দেখতে পায়! এইভাবে মিনিট পাঁচেক কাটল। নীরবতার ভিতরে কেমন একটা বন্য শ্বাস-প্রশ্বাসের শব্দ আমার কানকে আঘাত করতে লাগল বারংবার। আর সেই পূতিগন্ধ! উঃ, অসহনীয়!

আবার খটখট করে শব্দ হল! কেউ আমার টেবিলের উপরে জিনিসপত্তর নাড়াচাড়া করছে! আমি ঘুমোচ্ছি ভেবে নিশ্চয় সে নিশ্চিত হয়েছে!

আগে আন্দাজ করে নিলুম, চোর। আমার টেবিলের কোন দিকে আছে। তারপর কোনওরকম জানান না দিয়ে আচম্বিতে এক লাফ মেরে টেবিলের সেইদিকে লাফিয়ে পড়লুম এবং চোরকে দুই হাতে জড়িয়ে ধরতে গেলুম—

—সঙ্গে সঙ্গে দু-খানা অত্যন্ত সবল বাহু আমাকে এমন প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারলে যে, আমি আবার ছিটকে বিছানার উপরে এসে পড়লুম!

—দৈবগতিতে আমার হাত পড়ল ইলেকট্রিক টর্চের উপরে,-বন্দুকের সঙ্গে এটাকেও আমি প্রতি রাত্রে পাশে নিয়ে শয়ন করি।

টর্চটা তুলে নিয়েই টিপলুম চাবি এবং পর-পলকেই বৈদ্যুতিক আলো প্রবাহের মধ্যে আমার চোখের সুমুখে যো-মুখখানা জেগে উঠল, তার স্মৃতি আমি জীবনে ভুলতে পারব না!

রাশীকৃত উচ্ছৃঙ্খল কিলবিলে কালো সাপের মতন কেশগুচ্ছের মধ্যে একখানা ভয়ানক কালো মুখ! সে মুখ স্ত্রীলোকের এবং সে মুখ মানুষের-এবং সে মুখ মানুষের নয়! ওই অগ্নিবর্ষী দুটো ভাটার মতন ক্ষুধিত চক্ষু-ত মানুষের চোখ নয় কখনও! ওই দংশনোদ্যত ক্রুদ্ধ নিষ্ঠুর দন্তগুলো-ওগুলো কি মানুষের দাঁত?

হঠাৎ তীব্র আলোকছটায় মূর্তির চোখদুটো নিশ্চয় অন্ধ হয়ে গিয়েছিল!

আমি চিৎকার করে ডাকলুম—সর্দার, সর্দার, সর্দার!

কান ফটানো ভয়াবহ এক গর্জনে আমার তাঁবুর ভিতরটা পরিপূর্ণ হয়ে গেল—কোনও মানুষেরই কণ্ঠ সে রকম অমানুষী গর্জন করতে পারে না!

শিউরে উঠে বিছানা থেকে তাড়াতাড়ি বন্দুকটা তুলে নিলুম এবং সেই মুহূর্তেই মূর্তিটা সাঁৎ করে তাঁবুর ভিতর থেকে বেরিয়ে গেল!

এবং তারপরেই বাহির থেকে শুনলুম, ঘন ঘন হিংস্র গর্জন ও সর্দারের গলায় আর্তনাদের পর আর্তনাদ!

ঝড়ের বেগে বন্দুক নিয়ে বাইরে ছুটে গেলুম!

চাঁদের আলোয় সভয়ে দেখলুম, তাঁবুর দরজার সামনেই সর্দার মাটির উপরে পড়ে গোঁ গোঁ ও ছটফট করছে এবং একটা ঘোর কালো বিভীষণা নগ্ন মূর্তি সর্দারের দেহ বৃহৎ সর্পের মতন দুই কৃষ্ণ বাহু দিয়ে চেপে রেখে তার টুঁটি কামড়ে ধরেছে। প্রাণপণে! মূর্তিমতী হিংসা!

বন্দুক ছোড়বার উপায় নেই—সর্দারের গায়ে গুলি লাগবার ভয়ে। বন্দুক তুলে আমি সেই ভীষণ মূর্তির মাথায় কুঁদে দিয়ে করলুম। প্রচণ্ড এক আঘাত!

মূর্তিটা তীব্র—তীক্ষ্ণ স্বরে পশুর মতন একটা বিশ্রী আর্তনাদ করে ছিলা ছেঁড়া ধনুকের মতন সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে উঠল-তার মাথার এলানো

ঝাঁকড়া চুলগুলো চারিদিকে ঠিকরে পড়ল-তারপর সে আমাকে লক্ষ্য করে আহত কেউটের মতন এক লাফ মারলে—আমি দুই পা পিছিয়ে এলুম এবং সে আবার ঘুরে মাটির উপরে আছাড় খেয়ে পড়ে মড়ার মতন স্থির হয়ে রইল!

সর্দারের কাছে দৌড়ে গেলুম, কিন্তু সে নিজেই উঠে বসল।

—সর্দার, সর্দার, তোমার গলা দিয়ে রক্ত ঝরছে!

সর্দার কাপড় দিয়ে ক্ষতস্থান চেপে ধরে বললে, 'বেশি কামড়াতে পারেনি, কিন্তু আপনি আর একটু দেরি করলেই আমি মারা পড়তুম! ...কিন্তু-কিন্তু—ও কীসের আওয়াজ?' সে অত্যন্ত ভীত ভাবে চারিদিকে তাকাতে লাগল!

সত্য! নিঝুম রাত্রে আচম্বিতে অরণ্য যেন সজাগ হয়ে উঠেছে! মাটি থরথর করে কাঁপছে, বনের গাছ মড় মড় করে ভেঙে পড়ছে, বাঁশঝাড় টলমল করে টলছে! সঙ্গে সঙ্গে একটা একটানা অব্যক্ত, অদ্ভুত ও ভীতিময় সমবেত কণ্ঠধ্বনি ধীরে ধীরে আমাদের দিকে এগিয়ে আসছে!

ততক্ষণে আমাদের সমস্ত কুলি ঘটনাস্থলে এসে হাজির হয়েছে। প্রায় পরিপূর্ণ চন্দ্র তখন মাঝ আকাশে সমুজ্জ্বল মহিমায় বিরাজ করছে, আলো-আধারিমাখা অপূর্ব বনভূমির ধার দিয়ে চকচকে রুপোলি পাড়ের মতন নদীটি আপন মনে বয়ে যাচ্ছে কলসংগীতে মুখর হয়ে, এবং তৃণশ্যামল ভূমির উপরে আঁচল বিছিয়ে দিয়েছে স্বপ্নময় জ্যোৎস্না!

কিন্তু এই সমস্ত সৌন্দর্যকেই ব্যর্থ করে দিলে সেই ক্রমবর্ধমান অজ্ঞাত সম্মিলিত কণ্ঠের ভয় জাগানো কোলাহল! আমরা সকলে মিলে কী একটা আসন্ন বিপদের আশঙ্কায় অভিভূত

আমার পাশে এসে দাঁড়াল তার চোখদুটো তখন ভয়ে যেন ঠিকরে পড়ছে!

পূর্ব দিকের অরণ্যের ভিতর থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে ভীত পাখিরা ব্যাকুল স্বরে চিৎকার করে বাসা ছেড়ে উড়ে পালাল, গোটকয়েক সোনালি বানর ও একটা চিতাবাঘ সামনের জমি পার হয়ে পশ্চিম দিকে বেগে দৌড় দিলে!

সর্দার অস্ফুট স্বরে কাঁপতে কাঁপতে বললে, হুজুর, ওইদিকে। ওইদিক থেকেই ওরা আসছে।

অভাবিত কোনও বিভীষিকায় আমার গলা শুকিয়ে এসেছিল, কোনওরকমে জিজ্ঞাসা করলুম, 'ওরা? ওরা মানে কারা?'

কিন্তু সর্দারের গলা দিয়ে আর কোনও কথা বেরুল না।—তার মুখ মড়ার মতন সাদা। সেই বিপুল-অথচ অব্যক্ত কোলাহল তখন খুব কাছে এসে পড়েছে এবং মাটিতে তখন লেগেছে যেন ভূমিকম্পের ধাক্কা! আমি এমন অপার্থিব কোলাহল আর কখনও শুনিনি—এ মানুষের কোলাহল নয়, কিন্তু এ রকম কোলাহল তুলতে পারে এমন কোনও জন্তুও পৃথিবীতে আছে বলে জানি না!

হঠাৎ পূর্ব দিকের বাঁশঝাড়ে যেন ঝড়ের মাতন লাগল—কতকগুলো খুব বড়ো বাঁশ হুড়মুড় করে ভেঙে পড়ে গেল!

তারপরেই—ও কী ও? ওরা কারা? জ্যোৎস্নময় রাত্রে অরণ্যের স্বচ্ছ ছায়ায় দেখা যাচ্ছে এক জমাট অন্ধকারের জীবন্ত প্রাচীর!

স্তম্ভিত নেত্রে ভালো করে তাকিয়ে দেখলুম, সেই অন্ধকার প্রাচীরের যেন অসংখ্য বাহু আছে—বাহুগুলো মানুষের বাহুর মতন!

এমন সময়ে আমার পাশ থেকে একটা কালো বীভৎস মূর্তি বিদ্যুতের মতন ছুটে বেরিয়ে গেল-সে ছুটছে ওই অগণ্য বাহুকণ্টকিত জীবন্ত অন্ধকার প্রাচীরের দিকেই!

এক পলকের জন্যে ফিরে দেখলুম, মাটির উপরে সেই অচেতন দানবী মূর্তিটা আর নেই-কখন তার জ্ঞান হয়েছে আমরা কেউ দেখতে পাইনি, দেখবার সময়ও ছিল না!

দেখতে দেখতে মূর্তিটা সেই বিরাট অন্ধকার প্রাচীরের ভিতরে মিলিয়ে গেল!

আমি সেইদিকে লক্ষ্য করে বন্দুক তুলে গুলির পর গুলি ছুঁড়তে লাগলুম-উত্তেজনায়, দুর্ভাবনায়, ভয়ে ও বিস্ময়ে আমি যেন পাগলের মতন হয়ে উঠলুম—কাল রাত্রে টোটার মালা পরেই শুয়েছিলুম—বন্দুকে গুলি ভরি, আর ছুঁড়ি! নৈশ আকাশ আমার বন্দুকের ঘন ঘন গর্জনে বিদীর্ণ হয়ে যেতে লাগল, কতবার যে বন্দুক ছুঁড়লুম তা আমি জানি না!

হঠাৎ সর্দার আমার হাত চেপে ধরে বললে, হুজুর, মিথ্যে আর টোটা নষ্ট করছেন কেন?

তখন আমার হুঁশ হল! চক্ষের উদভ্রান্ত ভাব কেটে গেল, পূর্ব দিকে তাকিয়ে আর সেই জীবন্ত অন্ধকার প্রাচীরকে দেখতে পেলুম না! সেই অব্যক্ত ভীম কোলাহলের বিভীষিকাও আর নেই এবং বাঁশঝাড়ও আঁকা ছবির মতন একেবারে স্থির!

একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে আমি মাটির উপরে বসে পড়লুম।

শ্রান্ত স্বরে বললুম, ওরা কারা আসছিল?

গরিলারা।

—গরিলারা? কেন?

—টানাকে নিয়ে যাবার জন্যে।

—টানা আবার কে?

—যে চুরি করতে রোজ আপনার তাঁবুর ভিতরে ঢুকত!

—সর্দার, তুমি কি পাগল হয়ে গিয়েছ? তুমি কী বলছ কিছুই বুঝতে পারছি না!

—হুজুর, টানা হচ্ছে মানুষের মেয়ে। তার বয়স যখন এক বছর, গরিলারা তখন তাকে চুরি করে নিয়ে পলায়। সে আজ পনেরো বছর আগেকার কথা! সেইদিন থেকেই সে গরিলাদের সঙ্গে সঙ্গে আছে, মানুষ হলেও তার ব্যবহার এখন গরিলারই মতন। অনেকদিন আগে আমি এই গল্প শুনেছিলুম, কিন্তু টানাকে আজ প্রথম দেখলুম। আল্লার কাছে প্রার্থনা তাকে যেন আর কখনও না দেখতে হয়!

চন্দ্রলেখায় সুদূর বনভূমিকে পরি-পুরীর মতন দেখাচ্ছে। মানুষের মেয়ে টানা,-কিন্তু মানুষ এখন তার কাছে শত্রুর জাতি! হয়তো বনের ভিতরে বসে টানার গরিলা অভিভাবকরা এখন তার মাথার ব্যথায় আদর করে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে! আচ্ছন্নের মতন বনের দিকে তাকিয়ে আমি অবাক হয়ে বসে রইলুম! কী বিস্ময়কর এই বিচিত্র জগৎ।

সিংহের গহ্বরে

আমি তখন আফ্রিকার। উগান্ড প্রদেশে।

একটা সিংহ আমার বন্দুকের গুলিতে জখম হয়ে পালিয়ে গিয়েছে,-মাটির উপরে রক্তের দীর্ঘ রেখা রেখে। সেই রক্তের দাগ দেখে দেখে আমি সিংহের খোঁজে এগিয়ে চলেছি। আমার সঙ্গে আছে। কাফ্রি জাতের কয়েকজন লোক।

সামনেই মস্ত এক পাহাড়। একটা পথ সমতল ক্ষেত্র থেকে পাহাড়ের উপরে উঠে মিলিয়ে গেছে। সেই পথ দিয়েই যে সিংহটা পলায়ন করেছে, তার স্পষ্ট চিহ্ন দেখতে পেলুম।

আমি পাহাড়ের উপরে ওঠবার উপক্রম করছি—এমন সময়ে কফ্রিদের দলের সর্দার আমাকে বাধা দিয়ে বললে, হুজুর, ও পাহাড়ে উঠবেন না!

কেন?

—ও হচ্ছে শয়তানের পাহাড়া!

বিস্মিত হয়ে বললুম, শয়তানের পাহাড়! সে আবার কী?

সর্দার মুখখানা বেজায় গভীর করে বললে, ও পাহাড়ের শেষ নেই। ওর ভেতরে কারা থাকে তা আমি দেখিনি, কিন্তু শুনেছি তারা মানুষ নয়।

—তা আর আশ্চর্য কী? বনে-জঙ্গলে তো মানুষের বাস না থাকবারই কথা। আর আমি তো এখানে মানুষ শিকার করতে আসিনি!

—না, হুজুর! আপনি আমার কথা বুঝতে পারছেন না! ও পাহাড়ের ভেতরে আছে জুজুদের রাজ্য। তাদের চেহারা দেখলেই মানুষের প্রাণ বেরিয়ে যায়!

ওখানে যাবই! এসো আমার সঙ্গে!

সর্দার ভয়ে আঁতকে উঠে দু-পা পিছিয়ে গিয়ে বললে, আমি? এত তাড়াতাড়ি মরতে রাজি নই! আমার দলের কেউই ওখানে যাবে না-হুজুর বরং নিজেই জিজ্ঞাসা করে দেখুন!

আমাকে কিছু জিজ্ঞাসা করতেও হল না-দলের সবাই একবাক্যে বলে উঠল, আমরা কেউ যাব না!

ফাঁপরে পড়ে গেলুম। যে-সিংহটার পিছু নিয়েছি, তেমন প্রকাণ্ড সিংহ বড়ো একটা চোখে পড়ে না। বন্দুকের গুলিতে সে এমন সাংঘাতিক ভাবে আহত হয়েছে যে, আর বেশিদূর পালাতে পারবে বলেও মনে হয় না। এমন একটা শিকারকে হাতছাড়া করব?

যা থাকে কপালে, এগিয়ে পড়ি! এই ভেবে বললুম, আচ্ছা সর্দার, তোমরা তবে আমার জন্যে এইখানেই অপেক্ষা করো, —আমি সিংহটাকে শেষ করে ফিরে আসছি!

সর্দার বললে, হুজুর আমার কথা শুনুন, ওই জুজু পাহাড়ে গেলে কোনও মানুষ আর বাঁচে না!

অসভ্যদের কুসংস্কার দেখে আমার হাসি পেল। আমি আর কোনও জবাব না দিয়ে, রক্তের চিহ্ন ধরে ধীরে ধীরে পাহাড়ের পথ বেয়ে উপরে উঠতে লাগলুম।

আহত ব্যাঘ্র বা সিংহ যে কী বিপজ্জনক জীব প্রত্যেক শিকারিই তা জানে। কাজেই খুব হাঁশিয়ার হয়ে বন্দুক তৈরি রেখেই আমি এগিয়ে চলেছি।

প্রায় তিনশো ফুট উপরে উঠে দেখলুম, রক্তের দাগ হঠাৎ পথ ছেড়ে ডান দিকের এক জঙ্গলের ভিতরে গিয়ে ঢুকেছে। সে এমন ঘন জঙ্গল যে, তার ভিতরে সিধে হয়ে দাঁড়িয়ে থাকাই অসম্ভব।

আমাকে তখন শিকারের নেশায় পেয়ে বসেছে। একটুও ইতস্তত না করে আমি হাঁটু গেড়ে বসে পড়লুম, তারপর হামাগুড়ি দিয়ে জঙ্গল ভেদ করে অগ্রসর হলুম। জঙ্গলের নিবিড়তা দেখে বেশ বোঝা গেল, এ তল্লাটে কোনওদিন কোনও মানুষের পা পড়েনি। চারদিক ভয়ানক নির্জন। যেখান দিয়ে যাচ্ছি, দিনের বেলাতেও সেখানে আলো ঢোকে না।

হঠাৎ বাধা পেলুম। পাহাড়ের গায়ে সুমুখেই একটা গুহা রয়েছে এবং রক্তের দাগ গিয়ে ঢুকেছে সেই গুহার মধ্যেই।

আহত সিংহটা আছে তাহলে ওই গুহার ভিতরেই? হয়তো ওই গুহাটাই হচ্ছে তার বাসা!

গুহার ভিতরে কী অন্ধকার! অনেক উঁকিঝুঁকি মেরেও কিছুই দেখতে পেলুম না। সিংহটোরও কোনও সাড়া নেই। হয়তো ভিতরে বসে সে-ও আমার গতিবিধি লক্ষ করছে। হয়তো আচম্বিতে মহা ক্রোধে আমার উপরে সে লাফিয়ে পড়বে!

কাছে ইলেকট্রিক টর্চ ছিল। টর্চটা জ্বেলে গুহার ভিতরে আলো ফেললুম। সঙ্গে সঙ্গে দেখলুম, গুহার মুখ থেকে হাত-পাঁচেক তফাতেই প্রকাণ্ড একটা সিংহের দেহ মেঝের উপরে কাত হয়ে পড়ে রয়েছে!

টর্চের তীব্র আলোতেও সিংহটা একটুও নড়ল না! খানিকক্ষণ লক্ষ করতেই বুঝলুম, তার দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসেরও লক্ষণ নেই! সিংহটা মরেছে!

কিন্তু সাবধানের মার নেই। আহত জন্তুরা অনেক সময়ে এমনি মরণের ভান করে।

তারপর হঠাৎ শিকারির ঘাড়ের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়ে মরণ কামড় বসিয়ে দেয়! কাজেই টর্চটা কৌশলে জ্বেলে রেখেই সিংহটার দেহের উপরে আরও দু-দুটো গুলিবৃষ্টি করলুম। তার দেহ তবু একটুও নড়ল না। তখন নিশ্চিন্ত হয়ে আমি গুহার ভিতরে প্রবেশ করলুম। এত কষ্ট সার্থক হল বলে আমার প্রাণ তখন আমোদে মেতে উঠেছে!

গুহাটা ছোটো। কিন্তু কী ভীষণ স্থান! মাথার উপরে কালো পাথর, আশেপাশে কালো পাথর, পায়ের তলায় কালো পাথর-আর তাদের গায়ে মাখানো কালো অন্ধকার! সেই কালোর ঘরে চারিদিকে বিশ্রী ভয়াবহ ভাব সৃষ্টি করে মেঝের উপরে সাদা ধবধবে যে জিনিসগুলো পড়ে রয়েছে, সেগুলো মাংসহীন হাড় ছাড়া আর কিছুই নয়! হয়তো তার ভিতরে মানুষেরও হাড়ের অভাব নেই!

মানুষের কথা মনে হতেই আর একটা জিনিস আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করলে। গুহার কোণে হাড়ের রাশির সঙ্গে কালো রঙের কী একটা পড়ে রয়েছে। বন্দুকের নল দিয়ে নেড়েচেড়ে বোঝা গেল সেটা একটা জামা ছাড়া আর কিছুই নয়!

জামা! কোট! তাহলে এ সিংহটার মানুষ খাওয়ারও অভ্যাস ছিল! বন্দুকের সাহায্যে কোঁটটাকে উপরে তুলতেই কী একটা জিনিস তার ভিতর থেকে মাটিতে পড়ে গেল।

হেঁট হয়ে দেখি, একখানা পকেট বই! সিংহের আক্রমণে যার প্রাণের প্রদীপ নিবে গেছে, নিশ্চয়ই এটি সেই হতভাগ্যেরই সম্পত্তি!

খুব সম্ভব এটি কোনও শ্বেতাঙ্গ শিকারির জিনিস। ওর ভিতরে হয়তো তার পরিচয় লেখা আছে, এই ভেবে আমি পকেট বইখানা কৌতুহলী হয়ে কুড়িয়ে নিলুম।

পকেট বইখানা খুলে, তার উপরে টর্চের আলো ফেলেই চমকে উঠলুম! এর পাতায় পাতায় যে বাংলাতে অনেক কথা লেখা রয়েছে! আমার

মন বিপুল বিস্ময়ে অভিভূত হয়ে গেল! কোথায় বাংলা দেশ, আর কোথায় উগান্ডার সিংহ বিবর! ঘরমুখো বাঙালি এতদূরে ছুটে এসেছে নিষ্ঠুর সিংহের ক্ষুধার খোরাক জোগাবার জন্যে!

তারপরেই মনে হল, —এ ব্যাপারে। আর যে কেহ অবাক হতে পারে, কিন্তু আমার আশ্চর্য হওয়া উচিত নয়! কারণ, আমিও তো বাঙালি- এবং আমিও তো আজকেই সিংহের খোরাক হলেও হতে পারতুম! তারপর ওই হতভাগের মতন আমারও হাড়গুলো হয়তো এখানকার অস্থিস্থাপকে আরও কিছু উচু করে দিত। সে হাড়গুলো দেখে কেউ আমার কোনও পরিচয়ই জানতে পারত না!

সেই ভীষণ গুহারা-হিংসার ও হত্যার গুহার এবং তার সামনেকার জঙ্গলের ভিতর থেকে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে বাইরের খোলা হাওয়ায় এসে দাঁড়ালুম।

তারপরেই মনে পড়ল কাফ্রিদের ভয়ের কথা-শিকারের উত্তেজনায় এতক্ষণ যে কথা ভুলে গিয়েছিলুম!

ওরা এই পাহাড়টাকে জুজু পাহাড় নাম দিয়েছে! কেন? ওরা বলে, এখানে যারা থাকে, তাদের দেখলেই মানুষ মরে যায়। কেন? এ মুলুকের কোনও মানুষই এ পাহাড়ের ত্রিসীমানায় আসে না। কেন?

তীক্ষ্ণ চোখে চারিদিকে তাকিয়ে এইসব ‘কেন’র জবাব খোঁজবার চেষ্টা করলুম। কিন্তু সন্দেহজনক কিছুই আবিষ্কার করতে পারলুম না। নির্জন পথ, নির্জন পাহাড়, নির্জন অরণ্য! নিস্তব্ধতা ও নির্জনতার উপরে

ধীরে ধীরে গোধূলির স্নান আলো নেমে আসছে! এই নিস্তব্ধতা ও নির্জনতা কেমন অস্বাভাবিক বলে মনে হল। তা ছাড়া আমার মনে কোনওরকম ভয়ের ভাবই জাগল না।

সন্ধ্যা আসছে, —এখানে আর অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নয়। তাড়াতাড়ি পাহাড় থেকে নেমে এলুম।

কাফ্রিদের সর্দারের মুখের ভাব দেখেই বুঝলুম, আমি যে আবার ফিরে আসব, এ আশা সে করেনি!

ভয় নেই, এখনও আমি ভূত হইনি।

সর্দার খুব ভীত কণ্ঠে খুব মৃদুস্বরে বললে, আপনি তাদের দেখেছেন?

—কাদের?

—যারা মানুষ নয়?

—হ্যাঁ, মানুষ নয় এমন একটা জীবকে আমি দেখেছি বটে।

সর্দার ঠক ঠক করে কাঁপতে লাগল, তার মুখ দিয়ে আর কথা বেরুল না! তার ভাব দেখে আমি হো হো করে হেসে উঠে বললুম, হ্যাঁ সর্দার! মানুষ নয় এমন একটা জীবকে আমি সত্যিই দেখেছি।—আর সে জীবটা হচ্ছে আমাদেরই সেই আহত সিংহটা! একটা গুহার ভেতরে সে মরে কাঠ হয়ে আছে!

সর্দারের যেন বিশ্বাস হল না। থেমে থেমে বললে, আর কিছুই দেখেননি হুজুর?

—কিছু না-কিছু না-একটা নেংটি ইদুর পর্যন্ত না!

সর্দার তখন আশ্বস্ত হয়ে বললে, তাহলে আপনি ভাগ্যবান পুরুষ। ও পাহাড়ে যারা যায়, তারা আর ফেরে না।

আমি বললুম, আচ্ছা সর্দার, বলতে পারো, আমার আগে ও পাহাড়ে আর কোনও বাঙালি কখনও গিয়েছিল?

—হ্যাঁ হুজুর, গিয়েছিল। ঠিক এক বছর আগে! আমিই তাকে পথ দেখিয়ে এখানে নিয়ে এসেছিলুম। আপনার মতন সে-ও আমার কথা শোনেনি। আমার মানা না মেনেই সেই বাবু ওই পাহাড়ের ভেতরে যায়। কিন্তু সে বাবু আর ফিরে আসেনি।

আমি বললুম, কেমন করে সে ফিরবে? তার হাড় সে সিংহের গর্তের ভিতরে পড়ে রয়েছে!

কিন্তু সেই বাঙালিবাবুর প্রাণ গেছে যে সিংহের কবলে, সর্দার একথা বিশ্বাস করতে চাইলে না। সে 'শয়তান', 'জুজু' ও আরও কত কী নাম করে নানান কথা বলতে লাগল—কিন্তু সেসব কথায় আমি আর কান পাতলুম না।

পকেট বুকখানা এখন আমার পকেটেই আছে। ঠিক করলুম 'ক্যাম্পে' ফিরেই সেখানা ভালো করে পড়ে মৃত বাঙালিটির পরিচয় জানবার চেষ্টা করব।

আহা, বেচারি! হয়তো তার মৃত্যু সংবাদ এখনও তাঁর আত্মীয়স্বজনরা জানতেও পারেনি!

পিপের চোখ

খাওয়াদাওয়ার পর রাত্রে ক্যাম্প খাটে শুয়ে সেই পকেট বুক বা ডায়েরিখানা পড়তে শুরু করলুম।

যতই পড়ি, অবাক হয়ে যাই! এ এক অদ্ভুত, বিচিত্র, অমানুষিক ইতিহাস বা আত্মকাহিনি, গোড়ার পাতা পড়তে আরম্ভ করলে শেষ পাতায় না গিয়ে থামা যায় না। এমন আশ্চর্য কাহিনি জীবনে আর কখনও আমি শুনিনি—শুনব বলে কল্পনাও করিনি!

শহরে বসে কারুর মুখে এ কাহিনি শুনলে কখনও বিশ্বাস করতুম না। কেউ একে সত্য বলে চালাবার চেষ্টা করলে তাকে নিশ্চয়ই আমি পাগলা গারদে পাঠাতে বলতুম।

কিন্তু এইখানে, —আফ্রিকার এই বনে! এখানে বসে আজ সবই সম্ভব বলে মনে হচ্ছে! তাঁবুর পর্দা তুলে একবার বাইরের দিকে তাকিয়ে দেখলুম।

কী পরিষ্কার,রাত! আকাশে যেন জ্যোৎস্নার সমুদ্র এবং বাতাসে যেন জ্যোৎস্নার ঝরনা! ওই তো জুজু পাহাড়-তার মেঘ-ছোঁয়া শিখরের উপরে পূর্ণচাঁদের রৌপ্য মুকুট! পাহাড়ের নীচের দিক গভীর জঙ্গলে ঢাকা-মানুষ যার মধ্যে ভরসা করে ঢেকে না। কিন্তু ফুটফুটে চাদের আলোয় এই ভয়াল গহন বনকেও দেখাচ্ছে আজ চমৎকার!

এই আনন্দময় সুন্দর চন্দ্রলোকের মধ্যেও যে অরণ্যের চিরন্তন নাট্যলীলা বন্ধ হয়ে নেই, তার সাড়াও কনের কাছে বেজে উঠছে অনবরত। কাছে, দূরে, আরও দূরে বনের মাটি কাঁপিয়ে ঘন ঘন বজ্রধ্বনির মতন সিংহদের ক্ষুধার্ত গর্জন শোনা যাচ্ছে, সভয়ে দুদ্দুড়িয়ে জেব্রার দল পলায়ন করছে—তাদের অসংখ্য ক্ষুরের শব্দ! হায়েনারা থেকে থেকে রাক্ষুসে। অট্টহাসি হাসছে! গাছের উপরে বানরদের পাড়ায় কিচির-মিচির আওয়াজ এবং হয়তো সাপের মুখে পড়ে কোনও পাখি মৃত্যু যাতনায় আর্তনাদ করে উঠল ও তাই শুনে আশপাশের পাখিরা সচকিত হয়ে ডানা ঝাপটা দিলে! মাঝে মাঝে তক্ষকের মতন কী একটা জীব ডেকে উঠে যেন জানিয়ে দিচ্ছে, এই জীবনযুদ্ধক্ষেত্রে সে-ও একজন যোদ্ধা! প্যাঁচারা চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে উড়ে যাচ্ছে—রাত্রিকে যেন বিষাক্ত করে! এইসব শব্দ রেখার মতন এসে পড়ছে যেন শব্দময় আর একখানা বিরাট পটের উপরে এবং তা হচ্ছে অনন্ত অরণ্যের অশ্রান্ত, অব্যক্ত ধ্বনি! শব্দ-পটের উপরে শব্‌দ-রেখা পড়ে একে যাচ্ছে এক বিচিত্র শব্দচিত্র!

তাঁবুর দরজা থেকে অল্প তফাতে হিংস্র পশুদের ভয় দেখাবার জন্যে আগুন জ্বেলে, বসে বসে গল্প করছে কাফ্রি বেয়ারা ও কুলিরা। তাদের কালো কালো মুখগুলোর খানিক খানিক অংশ আগুনের আভায়. লাল দেখাচ্ছে। তাদের ভাষা জানি না, তারা কী গল্প করছে তাও জানি না, তবে একটা বিশেষ কথা বার বার আমার কানের কাছে বাজতে লাগল। তারা বারংবার উত্তেজিত স্বরে বলে বলে উঠছে, ‘জুজু! জুজু! জুজু!’

বুঝলুম, এখনও তাদের ভিতরে ওই জুজু পাহাড় নিয়েই আলোচনা চলছে! এরা হচ্ছে সরল অসভ্য মানুষ,-শহুরে সভ্য মানুষের মনের মতন এদের মন নানা চিন্তায় ভারাক্রান্ত হয়ে নেই, তাই এদের মাথার ভিতরে একটা কোনও বিশেষ নতুন চিন্তা ঢুকলে এরা সহজে আর সেটা ভুলতে পারে না।

কিন্তু জুজু পাহাড়ের যে বিভীষিকা এদের মধ্যে পুঞ্জীভূত হয়ে আছে, সত্যসত্যই সেটা কি কুসংস্কার ছাড়া আর কিছুই নয়?

এই অজানা বাঙালির লেখা ডায়েরিখানা পড়বার পর সে কথা তো আর জোর করে বলতে পারি না! এ ডায়েরি যিনি লিখেছেন তিনি ওদের মতন অসভ্য নন। লেখার ভাষা দেখেই বুঝেছি, তিনি সুশিক্ষিত ব্যক্তি। তিনি যে কোনও ভয়ংকর দুঃস্বপ্নের বর্ণনা দেননি, লেখা পড়লে তাও জানা যায়। কিন্তু.যেসব কথা তিনি লিখেছেন—

হঠাৎ তাঁবুর পর্দা ঠেলে কাফ্রিদের সর্দার ভিতরে প্রবেশ করল। তার মুখে ভয় ও উদ্বেগের চিহ্ন স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

আমি জিজ্ঞাসা করলুম, কী ব্যাপার, সর্দার?

সে বললে, আপনি কি এখানে শিকারের জন্যে আরও কিছুদিন থাকবেন?

—হ্যাঁ। এখানে দেখছি খুব সহজেই শিকার পাওয়া যায়। দিন পনেরো এখানেই থেকে যাব মনে করছি।

সর্দার বললে, তাহলে আমাদের বিদায় দিন। আমরা কাল সকালেই এখান থেকে পালাতে চাই!

আশ্চর্য হয়ে বললুম, সে কী! কেন?

সর্দার বললে, এ জায়গায় জ্যান্ত মানুষের থাকা উচিত নয়! এখানকার ইট-কাঠপাথরের ওপরেও জুজুর অভিশাপ আছে।

আমি হেসে উঠে বললুম, সর্দার! আবার তুমি পাগলামি শুরু করলে?

সর্দার মাথা নেড়ে বললে, না। হুজুর, না! এ পাগলামির কথা নয়। আজ এইমাত্র স্বচক্ষে যা দেখলুম!

কৌতুহলী হয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, স্বচক্ষে কী তুমি দেখেছ? ভূত? জুজু? পেতনি? না রাক্ষস?

সর্দার অত্যন্ত গভীর হয়ে গিয়ে বললে, না। হুজুর, না! এসব ব্যাপার নিয়ে ঠাট্টা করা ভালো নয়। আজ আমি স্বচক্ষে যা দেখেছি, আর-একবার তা দেখলে আমি আর বাঁচব না!

অধীর ভাবে বললুম, কিন্তু তুমি কী দেখেছ, আগে সেই কথাটাই বলো না!

—আমরা জানতুম হুজুর, জুজুরা ওই পাহাড়ের বাইরে আসে না। তাই আমরা নির্ভয়ে এদিকে-ওদিকে চলা ফেরা করে বেড়াচ্ছিলুম। কিন্তু আজ দেখছি, জুজুরা পাহাড় ছেড়ে নীচেও নামে। বোধহয় এটা আপনার দোষেই। আপনি আমাদের বারণ শুনলেন না। মানুষ হয়েও পাহাড়ে উঠে

জুজু পাহাড়ের পবিত্রতা নষ্ট করলেন!! তাই আপনাকে শাস্তি দেবার জন্যে তারা পাহাড় ছেড়ে নেমে এসেছে।

আমি শুয়েছিলুম। এইবারে উঠে বসে বিরক্ত স্বরে বললুম, সর্দার! হয় তুমি কী দেখেছি বলো, নয়। এখান থেকে চলে যাও! তোমার বাজে বকুনি শোনবার সময় আমার নেই।

সর্দার বললে, একটু আগে আমি নদী থেকে এক বালতি জল আনতে গিয়েছিলুম। ফেরবার সময়ে ঠিক আমার সুমুখ দিয়েই একটা জিনিস গড়াতে গড়াতে তিরবেগে এধার থেকে পথ পার হয়ে ও ধারের জঙ্গলের ভেতরে ঢুকে গেল। ধবধবে চাঁদের আলোয় সে জিনিসটাকে আমি স্পষ্ট দেখতে পেলুম।

—সে জিনিসটা কী? কোনও জন্তু-টন্তু?

না।

—মানুষও নয়?

—না। একটা ছোটো পিপে।

আমি বাধো বাধো স্বরে বললুম, একটা—ছোটো—পিপে?

—হ্যাঁ হুজুর। একটা ছোটো পিপে। কে কবে দেখেছে, পিপে আবার জ্যান্ত হয়ে গড়িয়ে বেড়ায়?

—হয়তো কেউ তোমাকে ভয় দেখাবার জন্যে পিপেটাকে ধাক্কা মেরে গড়িয়ে দিয়েছিল!

—না হুজুর! আমি দিব্যি গেলে বলতে পারি, সেখানে আমি ছাড়া আর জনপ্রাণী ছিল না। তারপর, আরও শুনুন। আমি বেশ ভালো করেই দেখেছি, সেই চলন্ত পিপেটার ভেতর থেকে দু-দুটো জ্বলন্ত রাক্ষুসে চোখ ভয়ানক ভাবে কটমট করে আমার দিকে তাকিয়ে আছে! জলের বালতিটা সেখানেই ফেলে চোঁ-চোঁ দৌড় মেরে আমি পালিয়ে এসেছি। পিপে যেখানে হেঁটে বেড়ায় আর চোখ কাটমটিয়ে তাকায়, সেখানে আর আমাদের থাকা চলে না। আমরা কাল সকালেই এ মুলুক ছেড়ে সরে পড়ব!' —এই বলে সর্দার চলে গেল।

এবার আর সর্দারের কথা আমি হেসে উড়িয়ে দিতে পারলুম না। কারণ এই ডায়েরিখানা আমি পড়েছি। সর্দারের কথা মিথ্যা বললে, যিনি ডায়েরি লিখেছেন তাকেও মিথ্যাবাদী বলতে হয়!

অবশ্য ডায়েরির অনেক জায়গায় চোখ বুলিয়ে আমার সন্দেহ হয়েছে বটে যে, আমি যেন কোনও ছেলে ভুলানো হাসির গল্প বা মজার রূপকথা পড়ছি, কিন্তু তবু লেখককে একেবারে অবিশ্বাস করতে পারছি না। হয়তো মাঝে মাঝে বর্ণনার অত্যুক্তি বা অতিরঞ্জন আছে—সত্যিকার জীবনের কথা লিখতে বসেও অধিকাংশ লেখক যে লোভ সংবরণ করতে পারেন না! কিন্তু...কিন্তু, বিংশ শতাব্দীর কলেজে পড়া মোটরে চড়া বিজ্ঞান জানা সভ্য মানুষ আমি, একটা অসভ্য কাফ্রির কথা শুনে এবং একজন অচেনা মৃত ব্যক্তির ডায়েরির পাতা উলটে এমনধারা অদ্ভুত কাণ্ডকে ধ্রুবসত্য বলে একেবারে বিনা দ্বিধায় মেনে নেব?

কে জানে, ডায়েরি যিনি লিখেছিলেন, তার মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছিল কি না? কে জানে, তিনি "গালিভারের ভ্রমণ কাহিনি"র মতন একখানা কাল্পনিক উপন্যাস রচনা করে গেছেন কি না? হয়তো আজ তিনি এ প্রশ্নের সদুত্তর দিতে পারতেন। কিন্তু মৃত্যু যাঁর মুখ বন্ধ করে দিয়েছে, তার কাছ থেকে আর কোনও উত্তর পাবারই আশা নেই।

তারপরেই মনে হল, তবু সর্দার আজ এখনই যে গল্প বলে গেল, তার সত্য-মিথ্যা তো আমি পরীক্ষা করে দেখতে পারি? ডায়েরির গল্পের সঙ্গে সর্দারের গল্পের কিছু কিছু মিল আছে। কেমন করে এমন মিল সম্ভবপর? সর্দারের গল্প যদি সত্য হয়, তাহলে ডায়েরির গল্প সত্য বলে মানা যেতে পারে। এমন একটা অসম্ভব বিস্ময়কর সত্যের সঙ্গে চাক্ষুস পরিচয়ের এই সুযোগ ছেড়ে দেওয়া উচিত নয়!

তখনই ক্যাম্প খাট ছেড়ে উঠে দাঁড়ালুম এবং শিকারের পূর্ণ পোশাক পরতে লাগলুম। পোশাক পরতে পরতে মনের ভিতরে কেমন একটা বিপদের সাড়া জেগে উঠল। কিন্তু সে ভাবটাকে আমি মনের ভিতরে স্থায়ী হতে দিলুম না।

বাংলার সবুজ কোলের শান্তি ছেড়ে যে লোক সুদূর আফ্রিকার নিবিড় জঙ্গলে কালো অন্ধকারের ভিতরে সিংহ, হাতি, গন্ডারের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এসেছে নির্ভয়ে এবং যার হাতে আছে বুলেট-ভরা বন্দুক ও কোমরে আছে ছ-নলা রিভলভার আর শিকারের ছোরা, বিপদের সামনে যেতে সে কোন ইতস্তত করবে? এই বিপদের গভীর আনন্দকে সজ্ঞানে স্বেচ্ছায় উপভোগ

করতে পারে বলেই পৃথিবীতে মানুষ আজ শ্রেষ্ঠ জীব হতে পেরেছে! উত্তর মেরু, দক্ষিণ মেরু, আমেরিকা, উড়োজাহাজ ও ডুবোজাহাজ প্রভৃতি আজ আবিষ্কৃত হয়েছে কেন? বিপদের দৌলতে! এইসব আবিষ্কারের জন্যে কত মানুষ হাসতে হাসতে প্রাণ দিয়েছে এবং কত মানুষ হাসতে হাসতে মৃত্যুর অধিক যন্ত্রণা ভোগ করেছে! অধিকাংশ আবিষ্কারের মূলেই আছে এই বিপদের আনন্দ! যে জাতি এই বিপদের সাধনা শিখতে পারে, সে জাতির উন্নতির পথে কোনও বাধাই ট্যাঁকে না।

এমনি সব ভাবতে ভাবতে পোশাক পরা শেষ হল। কোমরের বেল্টে একটা টর্চ তো গুঁজে নিলুমই, তার উপরে পেট্রল-জ্বলা একটা স্থির বিদ্যুতের মতন অতি উজ্জ্বল আলোর লণ্ঠনও নিতে ভুললুম না! আধা-অন্ধকারে অনেক সময়ে একটা বৃক্ষশাখার আবছায়া নড়লেও অন্য কিছু বলে ভ্রম হয়। স্পষ্ট আলো সন্দেহ দূর করে।

তাঁবুর বাইরে এসেই দেখি, কাফ্রি কুলিরা তাদের মেটমাট বাঁধতে বসেছে। সর্দারকে ডেকে শুধলুম, এসব কী হচ্ছে?

সর্দার বললে, ওরা সবাই ভয় পেয়েছে। অনেকে আজ রাতেই পালাবে। ...কিন্তু আপনি কোথায় যাচ্ছেন?

আমি বললুম, নদীর ধারে।

—নদীর ধারে! কেন হুজুর?

—তুমি আমার কাছে যা বলে এলে, তা সত্যি কি না দেখবার জন্যে!

সর্দারের মুখ দেখে মনে হল, সে যেন নিজের কানকেও বিশ্বাস করতে পারছে। না!..খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সে বললে, হুজুর অমন কাজ করবেন না! নদীর ধারে আজ জুজুর অভিশাপ জেগে উঠেছে, জ্যান্ত মানুষ সেখানে গেলে আর ফিরবে না। আজ সেখানে একলা গেলে আপনার মৃত্যু নিশ্চিত!

—কেন, একলা কেন, তুমিই আমাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে চলো- কোনও ভয় নেই।

সর্দার আঁতকে উঠে বললে, আমি যাব আপনার সঙ্গে? বলেন কী হুজুর। আমি তো পাগল হইনি! ঘরে আমার বউ ছেলে আছে, আমি কি শখ করে আত্মহত্যা করতে পারি?

—বেশ, তুমি যেয়ো না। কিন্তু নদীর কোন পথে তুমি সেই ব্যাপারটা দেখেছিলে?

সর্দার আঙুল দিয়ে দেখিয়ে বললে, এই সামনের পথ দিয়েই চলে যান। নদী খুব কাছেই। ...কিন্তু হুজুর, এখনও আমার কথা শুনুন, মানুষ হয়ে জুজুর সামনে যাবেন না।

আমি তার কথার জবাব না দিয়ে অগ্রসর হলুম। আজ যে পৃথিবীময় চাঁদের আলোর ছড়াছড়ি, একথা আগেই বলেছি! চারিদিক ধবধব করছে। নদীর ধারে যাবার পথের রেখা একটা ঘুমন্ত ও অতিকায় অজগরের মতন এঁকেবেঁকে স্থির হয়ে আছে। পথের দু-ধারে ঘন জঙ্গল চাঁদের আলোয় যেন

স্বপ্ন-মাখানো! সেই জঙ্গলের মাঝখানে জুজু পাহাড়ের মাথা উঁচু হয়ে উঠে যেন নীল আকাশকে ঢুঁ মারতে চাইছে।

চারিদিক নির্জন হলেও নিস্তব্ধ নয়। অরণ্যের রহস্যময় বিচিত্র শব্দগুলো এখনও অবিরাম জেগে আছে-হায়নার রাক্ষুসে হাসি, বানরদের ভীত স্বর, প্যাঁচার চিৎকার-এবং আরও কত কী, হিসাব করে বলা অসম্ভব! কেবল আফ্রিকার এ অঞ্চলের জঙ্গলের যা প্রধান বিশেষত্ব, সিংহদের সেই মাটি কাঁপানো ঘন ঘন মেঘের মতন গর্জন এখন আর একেবারেই শোনা যাচ্ছে না। কিন্তু এটা ভরসার কথা নয়, ভয়ের কথা! কারণ আফ্রিকার অভিজ্ঞ শিকারি মাত্রই জানেন, সিংহরা স্তব্ধ হলেই অত্যন্ত সাবধান হওয়া উচিত। কেননা, সামনে বা কাছে শিকারের দেখা বা সাড়া পেলেই সিংহরা একেবারেই চুপ মেরে যায়। তারপর চোরের মতন চুপিচুপি এসে শিকারের উপর লাফিয়ে পড়ে! কে জানে, কাছের কোনও জঙ্গলেই লুকিয়ে কোনও দুর্দান্ত পশুরাজ আমাকে দেখে আসন্ন ফলারের লোভে উন্মুখ হয়ে উঠেছে কি না?

লণ্ঠনটা সামনের দিকে বাড়িয়ে পথের দু-পাশে সতর্ক দৃষ্টি রেখে নদীর দিকে এগিয়ে চললুম। কিন্তু আমার মাথার ভিতরে তখন সিংহের জন্যে কোনও ভয়-ভাবনাই প্রবল হয়ে উঠতে পারলে না,-আমি ভাবছিলুম কেবল ডায়েরির ও সর্দারের কথা! জুজু এবং জীবন্ত পিপে!

দূরে—পথের পাশ থেকে ওপাশে চিতাবাঘের মতন কী একটা জন্তু তাড়াতাড়ি চলে গেল। একটা ঝুপসী গাছের ভিতর থেকে ডাল-পাতা সরিয়ে

চার-পাঁচটা বেবুন সবিস্ময়ে মাথা বাড়িয়ে মুখ খিঁচিয়ে উঠল—এই বিজন ও ভীষণ অরণ্য পথে রাত্রিবেলায় আমার মতন একাকী মানুষকে দেখবার আশা তারা যেন করেনি!

একটু তফাতে আচম্বিতে গাছপালার আড়ালে অনেকগুলো পাখি ব্যস্তভাবে চেঁচিয়ে উঠল। প্রত্যেক শিকারিই পাখিদের এইরকম আকস্মিক চিৎকারের অর্থ বোঝে। নিশ্চয়ই তারা কোনও হিংস্র জীবজন্তুর সাড়া পেয়েছে। যেখানে পাখিদের গোলমাল উঠেছে। সেইখানে লক্ষ করে দেখলুম, জঙ্গলটা দুলে দুলে উঠল,-যেন কোনও অদৃশ্য জন্তু তার ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছে।

আমিও থমকে দাঁড়িয়ে পড়লুম। খানিকক্ষণ অপেক্ষা করলুম। কিন্তু আর কোনও কিছু নজরে পড়ল না। আবার অগ্রসর হলুম। জঙ্গলের সেই জায়গাটা যখন পার হয়ে গেলুম, মনের ভিতরে কেমন অস্বস্তি হতে লাগল!

নির্জনতা, জ্যোৎস্না ধোয়া পাহাড়, বন, নদী এবং চাঁদের তিলকপরা নীলিমা! মাঝে মাঝে বনফুলেরও অভাব নেই! মাসিকপত্রের কবিদের মুখে শুনি, তাঁরা নাকি এইসব প্রাণের মতো ভালোবাসেন! কিন্তু তাদের দলের ভিতর থেকে কারুকে ধরে এনে আজ যদি এইখানে একলা ছেড়ে দি এবং বলি, ‘কবি এইবারে একটি কবিতা লেখো তো! তুমি যা যা ভালোবাসো এখানে সেসবের কিছুরই অভাব নেই! এইবারে একটি চাঁদ ওঠার, ফুল ফোটার আর মলয় বাতাস ছোটার বর্ণনা লেখো তো বাপু’—তাহলে কবি

কবিতা লেখেন, না। পিঠটান দেন, না ভিরমি যান, সেটা আমার দেখবার সাধ হয়!

নদীর ধারে এসে পড়লুম। কিন্তু এখনও পর্যন্ত অস্বাভাবিক কোনও ব্যাপারই চোখে পড়ল না। বন-জঙ্গলে যে সব ভয় থাকা স্বাভাবিক এখানে তার অভাব নেই, কিন্তু এসব তো থাকবেই এবং এমন ভয়ঙ্কর সৌন্দর্য তো শিকারির কাছে পরম লোভনীয়ই! কিন্তু আমি যা দেখবার জন্যে আজ প্রস্তুত হয়ে এসেছি, ডায়েরির পাতায় পাতায় যেসব অলৌকিক ঘটনা লেখা আছে এবং আজ সর্দারের মুখেও যার কিঞ্চিৎ বর্ণনা শুনেছি, তার ছিটেফোটাও তো এখনও পর্যন্ত দেখতে পেলুম না! মনে মনে হেসে মনে মনেই বললুম— 'পক্ষীরাজ ঘোড়া রূপকথায় আর শিশুর স্বপ্নেই দেখা যায়! আমি হচ্ছি একটি নিরেট বোকা, তাই সারাদিন পরিশ্রমের পর রাত্রের সুনিদ্রা নষ্ট করে বদ্ধপাগলের মতন এখানে ছুটে এসেছি!' নদীর তীরে নজর গেল। একটা মস্তবড়ো কুমির ডাঙার উপরে দেহের খানিকটা তুলে স্থির ভাবে আমার পানে তাকিয়ে আছে। যেন সে বলতে চায়— 'বন্ধু কী আর বলব! আমার কাছে আর একটু সরে এসে দ্যাখে না, খিদে পেলে আমি কী করি?'

মাঝনদীতে জীবন্ত 'বয়া'র মতন একদল হিপো ভাসছে। তিন-চারটে বাচ্চা হিপো জল খেলা খেলছে, —কেউ তার মায়ের কুপোর মতন পেটে গিয়ে ঢুঁ মারছে, কেউ বা জলের ভিতরেই উলটে পড়ে চমৎকার ডিগবাজি খাচ্ছে!

এমন সময়ে আচম্বিতে আমার মনে হল এখানে কেবল এই কুমির আর হিপের পালই নেই, —যেন আরও সব অদৃশ্য জীব আনাচে-কানাচে গা ঢাকা দিয়ে আমাকে লক্ষ করছে। মনের মধ্যে এই সন্দেহ হতেই চারিদিকে তাকিয়ে দেখলুম; কিন্তু সারা পথটা জনশূন্য ও চন্দ্রলোকে তন্দ্রাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে আছে এবং পথের দু-ধারের বন জঙ্গলের ভিতর থেকেও কোনওকিছুই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল না।

তবু বুকের কাছটা কেমনধারা করতে লাগল। এতক্ষণ এমন হয়নি, এখনই বা হচ্ছে কেন? এখানে আর কে থাকতে পারে? সিংহ? ব্যাঘ্র? গন্ডার?

আশ্চর্য নয়! নদীর ধারে হয়তো কোনও বড়ো জন্তু জলপান করতে এসে আমাকে দেখে আর বাইরে বেরুতে পারছে না। কিংবা হয়তো সুমুখেই তৈরি খাবার দেখে জঙ্গলের আড়ালে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ভাবছে জলপানের আগেই আমার ঘাড়ের উপরে একটি লম্ফত্যাগ করবে কি না!

তা এখানটা পড়তে তোমাদের যতই ভালো লাগুক না কেন? ব্যাপারটা তখন আমার মোটেই ভালো লাগছিল না। লণ্ঠনটা মাটির উপরে রাখলুম। টর্চটা কোমরবন্ধ থেকে খুলে পথের দু-পাশের ঝোপঝাপের উপরে আলো ফেলে পরীক্ষা করতে লাগলুম। হঠাৎ এক জায়গায় টর্চের আরো পড়তেই আমি চমকে উঠলুম!

কী ও-দুটো? একটা ঝাঁকড়া ঝোপের ভিতর থেকে দুটো অগ্নিময় গোলা আমার পানেই তাকিয়ে আছে! দুটো হিংসা ও ক্ষুধা ভরা জ্বলন্ত ও ভয়ানক চক্ষু!

ও-দুটো সিংহের, না ব্যাঘ্রের চক্ষু? যার চক্ষুই হোক, আমি আর এক মুহূর্তও নষ্ট করলুম না, তাড়াতাড়ি বন্দুক বাগিয়ে ধরে সেই দুটো অগ্নিগোলকের দিকে উপর-উপরি দুইবার গুলি বৃষ্টি করলুম!

তারপরেই ভয়ংকর এক আর্তনাদ-পৃথিবীর কোনও সিংহ ব্যাঘ্রই সেরকম আর্তনাদ করতে পারে না! এবং পরমুহূর্তেই একটা অদ্ভুত শব্দ হল—যেন পিপের মতন কী একটা বড়ো জিনিস গড়গড় করে ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছে!

এবং সঙ্গে সঙ্গেই সমস্ত জঙ্গলের ভিতর থেকে করা যেন অসংখ্য কণ্ঠে অমানুষিক স্বরে চিৎকার করতে লাগল—সেই সমস্বরের অপার্থিব চিৎকার শুনলে অতিবড়ো সাহসীরও বুকের রক্ত ঠান্ডা হয়ে যায়, —মানুষের কান তেমন চিৎকার কোনওদিন শোনেনি!

কিংকর্তব্যবিমূঢ়ের মতন ভাবছি।—কারা ওরা, অমন চিৎকার করতে পারে এমন কোনও জীব এই পৃথিবীতে আছে?—ঠিক সেই সময়ে আবার যে-কাণ্ডটা হল, তাতে আমার সমস্ত বুদ্ধি-সুদ্ধি যেন একেবারেই লোপ পেয়ে গেল!

আমি দাঁড়িয়েছিলুম পথের মাঝখানে। সেখান থেকে সামনের জঙ্গল ছিল প্রায় দশবারো হাত তফাতে! জঙ্গলের ভিতর থেকে যদি কোনও জন্তু

আমাকে আক্রমণ করতে আসে, তবে তাকে এই দশ-বারো হাত জমি আমার চোখের সামনে পার হয়ে আসতে হবে! কিন্তু হঠাৎ জঙ্গলের ভিতর থেকে মোটা সাপের মতন কী-একটা বিদ্যুৎ বেগে শূন্যপথে উড়ে আমার বাঁ হাতের উপরে এসে পড়ল, আমার বন্দুকটা তখনই সশব্দে পথের উপরে ঠিকরে পড়ে গেল এবং তারপরেই কে যেন বজমুষ্টিতে আমরা হাত চেপে ধরে আমাকে জঙ্গলের দিকে হিড় হিড় করে টেনে নিয়ে যেতে লাগল!

প্রথমটা আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলুম! তারপর কতকটা সামলে নিয়ে সেই বজ্রমুষ্টি থেকে ছাড়ান পাবার চেষ্টা করলুম—কিন্তু পারলুম না! তারপর প্রায় যখন জঙ্গলের কাছে গিয়ে পড়েছি, তখন আমার মাথায় বুদ্ধি জোগাল! আমার ডান হাত তখনও মুক্ত ছিল, ক্ষিপ্র হাতে কোমরবন্ধ থেকে রিভলভারটা বার করে নিয়ে আবার বার-তিনেক গুলি বৃষ্টি করলুম এবং অমনি আমার বাঁ হাতের উপর থেকে সেই বজমুষ্টির বাঁধনটা খুলে গেল!

অমন দশ-বারো হাত জমি পেরিয়ে সেটা যে কী এসে আমার হাত ধরলে ও ছেড়ে দিলে, কিছুই আমি ভালো করে বুঝতে বা দেখতে পেলুম না, কারণ তখন আমি বিস্ময়ে হতভম্ব ও আতঙ্কে অন্ধের মতন হয়ে গিয়েছি!

ভালো করে কিছু বোঝবার বা দেখবার ভরসাও আর হল না, —যে পথে এসেছিলুম আবার তিরের মতন সেই পথেই ছুটতে লাগলুম আমার তাঁবুর দিকে! পিছনে তখনও বহু কণ্ঠে সেই অমানুষিক চিৎকার বন-জঙ্গল, আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে তুলছে!

সে চিৎকার বোধ হয় আমার তাঁবুর লোকেদেরও কানে গিয়েছিল। কারণ উর্ধ্বশ্বাসে ছুটতে ছুটতে তাঁবুর কাছে এসে দেখি, আমার কাফ্রি-কুলিরা আগুনের চারিপাশে ভয়বিহ্বলের মতন দাঁড়িয়ে গোলমাল করছে!

আমাকে অমন ঝড়ের মতন বেগে ছুটে আসতে দেখে কুলিরা বোধ হয় স্থির করলে যে, যাদের ভয়ে আমি পালিয়ে আসছি, তারাও হয়তো আমার পিছনে পিছনেই ছুটে আসছে। তারা কী ভাবলে ঠিক তা জানি না, তবে আমাকে দেখেই কুলিরা একসঙ্গে আর্তনাদ করে উঠে যে যেদিকে পারলে পলায়ন করলে! তারপর তাদের আর কারুরই দেখা পাইনি!

কুলিদের কাপুরুষ বলে দোষ দিতে পারি না। আমি আজ স্বচক্ষে যা দেখলুম হয়তো তারাও এর আগেই তার কিছু কিছু দেখেছে বা শুনেছে! সে রাতটা তাঁবুর ভিতরে বসে দুশ্চিন্তায়, আতঙ্কে ও অনিদ্রায় যে ভাবে কেটে গেল, তা জানি খালি আমি এবং আমার ভগবানই!... পরের দিন সকালেই এই অভিশপ্ত দেশ ত্যাগ করলুম। আমার দামি বন্দুক আর লণ্ঠনটা নদীর ধারে পথেই পড়ে রইল। দিনের আলোতেও এমন সাহস হল না যে, ঘটনাস্থলটা আর একবার পরীক্ষা করে নিজের জিনিস আবার কুড়িয়ে নিয়ে আসি! বিপদেই মানুষের চরিত্র বোঝা যায় বটে, কিন্তু বিপদেরও একটা সীমা আছে তো? বিপদকে ভালোবাসলেও, সাঁতার না জেনে কে জলে ঝাঁপ দিতে যায়?

ডায়েরিতে যা লেখা আছে, আমি এইখানে তা উদ্ধার করে দিলুম। কাহিনিটি তোমরাও শোনো। যদি বিশ্বাস করতে ইচ্ছা না হয়, তবে অবিশ্বাস করো।

ডায়েরির লেখক তার গল্পটিকে বেশ গুছিয়ে বলেছেন। আমি তার কোনও কথাই বাদ দিইনি, কেবল সকলের সুবিধার জন্যে গল্পটিকে কয়েকটি পরিচ্ছেদে ভাগ করে দিলুম।

ডায়েরির গল্প শুরু হল

কুলিদের কথা যে সত্য, সে বিষয়ে আর কোনওই সন্দেহ নেই!

অসম্ভবও যে সম্ভব হয়, স্বচক্ষে আমি তা দেখেছি। আমার যদি যথেষ্ট মনের জোর না থাকত, তাহলে এতক্ষণে নিশ্চয়ই আমি বদ্ধপাগল হয়ে যেতুম।

সময়ে সময়ে নিজেরই সন্দেহ হয়েছে যে, আমি কোনও বিদঘুটে স্বপ্ন দেখছি না তো? কিন্তু সেই অদ্ভুত দেশে গিয়ে আমি যে সব ছবি এঁকেছিলুম, সেগুলো এখনও আমার কাছে রয়েছে। ছবিগুলো তো আর স্বপ্ন হতে পারে না!

এই গল্পটি আমি তাড়াতাড়ি লিখে রাখলুম। আমার শরীরের যে অবস্থা হয়েছে, তা আর বলবার নয়। আজ সাত দিন আমি কোনও নিরেট

খাবার খেতে পাইনি—আর জলপানের সুযোগ পাইনি তিন দিন! পাহাড়ের এদিকটা মরুভূমির মতন শুকনো। আমার আর এক পা চলবার শক্তি নেই।

এ গল্পের গোড়ার দিকটা যতই ভয়াবহ হোক, এর শেষ দিকটা হয়তো অনেকেরই কাছে প্রহসনের মতন হাসির খোরাক জোগাবে। অনেকেই হয়তো একে প্রহসনের মতোই হালকা ভাবে নেবেন। কিন্তু মানুষের এই জীবনটাই হচ্ছে প্রহসনের মতন! একজনের হাসি আর একজনের কাছে মৃত্যুর মতন সাংঘাতিক! গল্পের শেষ ঘটনাগুলি পড়ে পাঠকরা যখন হাসবেন, তখন তারা হয়তো মনেও করতে পারবেন না যে, ঘটনার সময়ে আমার মনের মধ্যে হাস্যরসের একটা ফোঁটাও বর্তমান ছিল না!

আমার এই কাহিনির নাম দেওয়া যেতে পারে—'দুঃস্বপ্নের ইতিহাস'! মানুষ স্বপ্নে যেসব ভয়ঙ্কর ও অলৌকিক দৃশ্য দেখবার সময়ে অত্যন্ত ভয় পায়, জেগে উঠে তার কথা মনে করে হাসি আসে। আমারও অবস্থা এখন অনেকটা সেইরকম! কেবল দুর্ভাগ্যের কথা এই যে, আমি যা দেখেছি তার কথা ভেবে অনেককাল ধরে হাসবার মতন পরমায়ু আমার নেই।

কোনওরকমে পাহাড়ের এই গুহার ভিতরে আশ্রয় নিয়ে আমার এই দুঃস্বপ্নের ইতিহাস লিখছি! আমি যে আর বেশিক্ষণ বাঁচব, এমন আশা রাখি না। তবু আমার ইতিহাস লিখে রেখে গেলুম এইজন্যে, কোনও না কোনও দিন হয়তো এটা অন্য মানুষের চোখে পড়বে।

কুলিরা কেউ আমার সঙ্গে আসতে রাজি হল না। সকলেরই মুখে এক কথা-'জুজু পাহাড়ে মানুষ যায় না।'

আমার রোখ বেড়ে উঠল। জুজু পাহাড়ের ভিতরে কী রহস্য আছে, না জেনে এখান থেকে ফিরব না, —এই পণ করে কুলিদের পিছনে ফেলেই আমি একলা পাহাড়ের উপরে উঠতে লাগলুম।

উঠছি, উঠছি, উঠছি! জুজু বলে কোনও কিছুর অস্তিত্ব দেখতে পেলুম না বটে, কিন্তু এই প্রকাণ্ড পাহাড়টা কী আশ্চর্যরকম নির্জন! কোথাও মানুষের একটা চিহ্নও নেই!

আরও খানিকটা উপরে ওঠবার পর আমার কেমন ভয় ভয় করতে লাগল। এ পাহাড়ে মানুষের পদচিহ্ন পর্যন্ত নেই কেন এবং কোনও মানুষ এখানে আসে না কেন? সূর্যের সোনার আলোয় ঝলমলে এমন সুন্দর পাহাড়; এখানে ওখানে কৌতুকময়ী ঝরনা রুপোর ধারা কুলকুচো করতে করতে ও নীলাকাশকে নিজের গানের ভাষা শোনাতে শোনাতে পাথর থেকে পাথরের উপরে লাফিয়ে নাচতে নাচতে পৃথিবীর কোলের উপরে ঝাঁপিয়ে পড়বার জন্যে নীচে—আরও নীচে নেমে যাচ্ছে—ফলে-ফুলে রঙিন ও লতায় পাতায় সাজানো, নরম ঘাসের সবজে সাটিনে ঢাকা আনন্দময় উপত্যক, এ তো কবির স্বর্গ, ভ্রমণকারীর তীর্থ। তবু মানুষ এই পাহাড়কে পরিত্যাগ করেছে কেন? এত বড়ো একটা চমৎকার পাহাড়, তবু কোথাও এর বর্ণনা শুনিনি কেন?

আর একটা অদ্ভুত ভাবে আচ্ছন্ন হয়ে আমি উপরে উঠছি। আশপাশে, আনাচ-কানাচ, বন-জঙ্গলের আড়াল দিয়ে যেন আরও করা সব নিঃশব্দ পদে আমার সঙ্গে সঙ্গেই উপরে উঠছে! এখানে মানুষ নেই, অন্য কোনও জীবেরও সাড়া নেই—তবু যেন আমি একলা নাই! করা যেন অদৃশ্য হয়ে আমার সমস্ত গতিবিধি সতর্ক দৃষ্টিতে লক্ষ করছে! এদিকে তাকাই ওদিকে তাকাই, সামনে ফিরি পিছনে ফিরি-এমনকি হঠাৎ ঝোপেকাপে গিয়েও উঁকি মারি, তবু জনপ্রাণীকেও দেখতে পাই না! তবু আসছে, আসছে—অদৃশ্য আত্মারা আমার সঙ্গে সঙ্গে আসছে আর আসছে আর আসছে।...এই অদ্ভুত ভাবটাকে কোনওরকমই মন থেকে মুছে ফেলতে পারলুম না! কী অসোয়াস্তি!

ঘণ্টা চারেক এগিয়ে যাবার পর হঠাৎ এক জায়গায় একটি ব্যাপার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

দু-ধারের পাহাড় কেটে কারা যেন একটা সরু রাস্তা তৈরি করেছে। রাস্তার মাঝে মাঝে শুকনো কাদা রয়েছে। তার উপরে মানুষের পায়ের ছাপ আছে কি না দেখবার জন্যে অনেকক্ষণ ধরে পরীক্ষা করলুম। মানুষের পায়ের একটিমাত্র ছাপও সেখানে নেই। তার বদলে কাদার উপরে অনেকগুলো টানা টানা বিচিত্র চিহ্ন দেখলুম। মাটি যখন ভিজে ছিল, তখন এই পথ দিয়ে যেন অনেকগুলো পিপের মতন জিনিস কারা গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে গেছে, তাদের পায়ের চিহ্নগুলো কোথায় গেল?... অদ্ভূত রহস্য!

পরীক্ষা করতে করতে হঠাৎ আমার পা গেল ফসকে! যেখানে দাঁড়িয়েছিলুম, ঠিক তার পাশেই ছিল একটা গভীর খাদ। কোনওরকমেই নিজেকে সামলাতে না পেরে আমি সেই খাদের ভিতরে গিয়ে পড়লুম।

গড়াতে গড়াতে পাতালের ভিতরে নেমে যাচ্ছি! দেহের উপরে আঘাতের পর আঘাত! চারিদিক অন্ধকার-যন্ত্রণায় চিৎকার করছি!

হঠাৎ পাথরের উপরে মাথা ঠুকে অজ্ঞান হয়ে গেলুম!

ঘোল হাত লম্বা হাত

যখন আমার জ্ঞান হল, দেখলুম। আমি একটা টেবিলের উপরে শুয়ে আছি। পরে জেনেছিলুম সেটা হচ্ছে "অপারেশন টেবিল"—অর্থাৎ যাকে বলে রোগীকে অস্ত্র করবার টেবিল!

ভালো করে চেয়ে দেখি, আমি টেবিলের উপরে শুয়ে নেই।—টেবিলটাই আছে আমার পিঠের উপরে! কড়িকাঠ থেকে এক ঝোলানো টেবিলে পিঠ রেখে আমি ঘরের মেঝের দিকে মুখ করে আছি! আমার হাত-পা বাঁধা নেই, তবু আমি পড়ে যাচ্ছি না! যদিও পরে এই রহস্যেরাও বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা শুনেছিলুম-কিন্তু তখন আমি অত্যন্ত আশ্চর্য ও আড়ষ্ট হয়ে ভাবতে লাগলুম, বোধ হয়। আমি দুঃস্বপ্ন দেখছি!

হঠাৎ চেয়ে দেখি, ঘরের মেঝেতে একটা পিপের ভিতর থেকে একখানা অদ্ভুত মুখ উকি মারছে! ছবিতে গোল চাঁদের ভিতরে চোখ নাক

ঠোঁট একে দিলে যে-রকম হয়, সেই মজার মুখখানা ঠিক সেইরকম দেখতে! তখন আমার দৃঢ় ধারণা হল যে, আমি স্বপ্ন ছাড়া আর কিছুই দেখছি না!

চাদমুখো লোকটা একটু হাসলে। বললে, এই যে, তোমার জ্ঞান হয়েছে দেখছি। অমল, তোমার মুখ দেখেই বোঝা যাচ্ছে, তুমি ভাবিছ এসব স্বপ্ন-না?

আমি হতভম্বর মতন বললুম, আপনি কী বলতে চান যে, আমি স্বপ্ন দেখছি না?

—না।

—এখন আমি কোথায়? এইটুকু আমার মনে আছে যে, আমি পাহাড়ের খাদে পড়ে গিয়েছিলুম!

—ঠিক তাই। তোমাকে আমরা সেইখান থেকেই কুড়িয়ে এনেছি। তুমি নিশ্চয়ই বাঁচতে না। তোমার মেরুদণ্ড আর দু-খানা পা ভেঙে গিয়েছিল। আমি বৈজ্ঞানিক উপায়ে আবার তোমাকে বাঁচিয়ে তুলেছি।

লোকটা বলে কী? আমি স্বপ্ন দেখছি না তো এ কী দেখছি? মানুষ কখনও ঝোলানো টেবিলে এমনভাবে পিঠ রেখে শূন্যে শুয়ে থাকতে পারে? আর নীচে ওই যে প্রকাণ্ড চাঁদের মতন মুখখানা আমার সঙ্গে কথা কইছে, ওরকম মুখ দুনিয়াতে কেউ কখনও দেখেছে? আমার মাথাটা বোঁ বোঁ করে ঘুরতে লাগল।

পিপের মুখ আবার বললে, আমল, এখন তুমি আরোগ্য লাভ করেছ।” আমি বললুম, “আপনি আমার নাম জানলেন কী করে?

—‘তোমার পকেট বই দেখে।...রোসো তোমাকে নামিয়ে দিচ্ছি।’—এই বলেই সেই চাঁদমুখো কেমন করে কী কল টিপলে জানি না, কিন্তু আমাকে সুদ্ধ নিয়ে টেবিলটা ধীরে ধীরে ঘুরে সোজা হয়ে মাটির উপরে গিয়ে দাঁড়াল।

চাঁদমুখো বললে, এইবার তুমি নীচে নামতে পারে!

আমি আস্তে আস্তে উঠে বসে টেবিল ছেড়ে নেমে পড়লুম। পিপের ভিতর থেকে একখানা হাত বেরুল—সেই হাতে একটা কাচের গেলাস। চাঁদমুখো বললে, নাও, এইটুকু পান করো।

গেলাসে সবুজ রঙের কী একটা তরল পদার্থ ছিল। যেমনি তা পান করলুম, অমনি আমার দেহের ভিতর দিয়ে যেন একটা জ্বালাময় বিদ্যুৎপ্রবাহ ছুটে গেল!

আমি সভয়ে বলে উঠলুম, এ আমায় কী খাওয়ালেন?

চাঁদমুখো হেসে বললে, ভয় নেই-ভয় নেই! ওতে তোমার উপকারই হবে!

আমি আবার জিজ্ঞাসা করলুম, আমি এখন কোথায় আছি?

আফ্রিকার এক গুপ্ত দেশে।

আপনি বাংলা শিখলেন কোথা থেকে?

এখানে সবাই বাংলা বলে। আমাদের ইতিহাস পরে বলব অখন, এখন যা বলি শোনো। আমি জানি তুমি বাঙালি। কিন্তু এ দেশে বিদেশিদের প্রবেশ নিষেধ। তবু যে তোমাকে এখানে নিয়ে এসেছি, তার কারণ

তোমাকে নিয়ে আমি একটা নতুন রকম পরীক্ষা করতে চাই। কিন্তু মহারাজা তোমাকে এখানে থাকতে দেবেন কি না জানি না। শীঘ্রই মহারাজার সভা বসবে। সেই সভায় স্থির হবে, তোমাকে এদেশে থাকতে দেওয়া হবে কি তোমাকে হত্যা করা হবে!

আমি চমকে উঠে বললুম, হত্যা?

চাঁদমুখো বেশ স্থির ভাবেই বললে, হ্যাঁ। এদেশে কোনও বিদেশি এলে তাকে হত্যা করাই হচ্ছে এখানকার আইন।

চমৎকার আইন! আমার বুক ভারী দমে গেল।

চাঁদমুখো বললে, কিন্তু অমল, এ কথা ভেবে এখন তুমি মাথা খারাপ কোরো না। তোমাকে যাতে হত্যা করা না হয়, আমি প্রাণপণে সে চেষ্টা করব।

আমি কৃতজ্ঞ স্বরে বললুম, ধন্যবাদ। কিন্তু আপনার নামটি জানতে পারি কি?

চাঁদমুখো বললেন, এ রাজ্যে কেউ আমার নাম ধরে ডাকে না। তুমি আমাকে পণ্ডিতমশাই বলে ডেকে। আমি মহারাজার প্রধান পণ্ডিত-জ্ঞান-বিজ্ঞানের চর্চা করাই আমার কাজ।'—বলেই পণ্ডিতমশাই ঘরের ভিতরে পায়চারি করতে লাগলেন।

এতক্ষণ পরে হঠাৎ একটা ব্যাপার দেখে আমার চক্ষুস্থির হয়ে গেল!! কী সর্বনাশ, পিপের ভিতর থেকে বেরিয়েছে তিনখানা মানুষের পা আর

পিপের একদিকে আছে পণ্ডিতমশাইয়ের চাঁদ-মুখ—এবং এই মুখ-পা-ওয়ালা পিপেটা আমার চোখের সামনে ঘরময় ঘুরে বেড়াতে লাগল।

একটা জাপানি রূপকথায় আশ্চর্য এক চায়ের কেন্টলির বর্ণনা পড়েছিলুম। সেই চায়ের কেটলিটার বিষম এক বদ অভ্যাস ছিল। মাঝে মাঝে হাত-পা-মুখ বার করে সে নাচের নানারকম প্যাঁচ দেখাত! কিন্তু সেসব হচ্ছে তো ছেলেভুলানো বাজে গল্প! আজ আমার চোখের সুমুখে হাত-পা-মুখ-ওয়ালা যে জ্যান্ত পিপেটাকে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি, একে তো গাঁজাখোরের নেশার খেয়াল বলে উড়িয়ে দেওয়া চলে না কিছুতেই!

আমি হাঁ করে অবাক হয়ে চেয়ে আছি দেখে পণ্ডিতমশাই মুচকে হেসে বললেন, আমার দেহটা একটু নতুন রকম দেখাচ্ছে? আচ্ছা, এসব কথা নিয়ে পরে আলোচনা করা যাবে অখন, আপাতত একটু কাজে আমি বাইরে যাচ্ছি। ততক্ষণ আমার মেয়ের সঙ্গে তুমি গল্প করো—আমি গেলেই সে আসবে!

কাগজের একরকম সাপ দেখেছি? যখন জড়ানো থাকে তখন খুব ছোটো। তারপর ছেলেরা যেই ফুঁ দেয় অমনি ফুড়ুৎ করে হাত খানেক লম্বা হয়ে যায়! ঠিক সেই ভাবেই পিপে-পণ্ডিতের পাশ থেকে ফুড়ুৎ করে একখানা হাত বেরিয়ে পড়ল এবং একটানে ঘরের দরজাটা খুলে ফেলেই হাতখানা চোখের নিমিষে আবার অদৃশ্য হয়ে গেল। পণ্ডিতমশাই যেখানে দাঁড়িয়েছিলেন সেখান থেকে ঘরের দরজাটা ছিল। ষোলো-সতেরো হাত তফাতে! তারপরেই দেখি, পণ্ডিতমশাইয়ের ঠ্যাং তিনখানাও গুটিয়ে পিপের

ভিতরে ঢুকে গেল এবং পিপেটা মাটির উপরে গড়াতে গড়াতে ঘরের দরজার ভিতর দিয়ে বেরিয়ে কোথায় অদৃশ্য হয়ে গেল!

নিজের চোখকেও আমি বিশ্বাস করতে পারলুম না-এও কখনও সম্ভব হয়? বিস্ফারিত নেত্রে দরজার দিকে তাকিয়ে আকাশ-পাতাল ভাবছি আর ঘেমে উঠছি, এমন সময়ে হঠাৎ দেখি, সেখানেও এক অপূর্ব নতুন মূর্তির আবির্ভাব!

মায়াময়ী কমলা

এবারে যার আবির্ভাব হল, তাকে দেখে ভয় পাবার কোনও কারণ ছিল না। কারণ তাকে দেখলে চোখ জুড়িয়ে যায়। আর প্রাণ-মন খুশি হয়ে উঠে। পরমাসুন্দরী সে-যেন রূপকথার রাজকুমারী!!

পরমাসুন্দরী মেয়ের কথা অনেক উপকথায়, অনেক কাব্যে এবং অনেক গল্প-উপন্যাসে পাঠ করেছি। কিন্তু এ মেয়েটির রূপ সেসব বর্ণনার চেয়েও ঢের বড়ো! এর চেয়ে সুন্দর রং, গড়ন ও নাক-চোখ-মুখের কল্পনাও করা অসম্ভব! সৃষ্টিছাড়া পিপে-জগতে স্বপ্নালোকের এই মানস-কন্যাকে দেখে যেন মোহিনী-মন্ত্রে আমার মন অভিভূত হয়ে গেল!

আমার কাছে এসে মধুর হাসি হেসে সে বললে, আপনিই বুঝি আমার বাবার অতিথি? আপনার নাম কী?

—আমলকুমার সেন।

—আপনি বুঝি খুব ভয় পেয়েছেন?

—এখানে এসে ভয় পায় না, এমন মানুষ দুনিয়ায় আছে নাকি? যে জীবটি এখনই এখান থেকে চলে গেল, তাকে বোধহয় তুমি দ্যাখোনি?

মেয়েটি খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, বাঃ, কেন দেখব না?

—তা দেখেও জিজ্ঞাসা করতে চাও, কেন আমি ভয় পেয়েছি! অমন আরও কতগুলো চাঁদমুখ তোমরা পিপেয় পুরে বন্ধ করে রেখেছ?

—অনেক। তা আর গুনে বলা যায় না।

—বলো কী! ওদের নিয়ে তোমরা কী করে?

—কী আবার করব? ওদের কেউ আমার বন্ধু, কেউ আমার শত্রু, কেউ আমার খেলার সাথি, কেউ আমার বাবা—

—তোমার বাবা! চাঁদের মতন গোল মুখ, ষোলো হাত লম্বা হাত, পিপের মতন দেহ আর তিনখানা পা, —উনিই কি তোমার বাবা?

—হ্যাঁ গো হাঁ, উনিই আমার বাবা!

—কিন্তু তুমি তো দেখছি আমাদেরই মতন মানুষ!

—যা দেখছেন এ চেহারা আমার আসল চেহারা নয়।

আমি হতভম্বর মতন বললুম, তার মানে?

—আমি আমার পূর্বপুরুষদের চেহারা নকল করেছি। আমার নিজের চেহারা আমি পছন্দ করি না।

মেয়েটি পাগলি নাকি! চেহারার আবার আসল নকল কী? বললুম, তোমার আসল চেহারা কী রকম শুনি?

—ওই বাবার মতনই আর কী! তবে বাবার গোঁফ আছে, আমার নেই! মাঝে মাঝে আমাকেও সেই মূর্তি ধারণ করতে হয়, কারণ এই নকল দেহ নিয়ে বেশিক্ষণ থাকা চলে না। কষ্ট হয়।

মেয়েটি বলে কী? পূর্বপুরুষদের চেহারার নকল, বাবার মতন মূর্তি ধারণ, —এসব উদ্ভট কথা শুনলেও যে পেটের পিলে চমকে ওঠে! এ কি আমার সঙ্গে ঠাট্টা করছে? কিন্তু তার সরল নির্দোষ শিশু মুখের পানে তাকালে তো সে কথা মনে হয় না!...তবে আমি কি সত্যসত্যই কোনও প্রেতলোকে এসে পড়েছি? পৃথিবীর অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিত বলেন, ইহলোকের পর পরলোক বলে যে জগৎ আছে, সেখানে প্রেত। আর প্রেতিনী বাস করে! এই কি সেই পরলোক? জুজু পাহাড়ের খাদের মধ্যে পড়ে গিয়ে আমার কি অনেকক্ষণ আগেই মৃত্যু হয়েছে—এখন কি আমিও ইহলোকের মানুষ নই এবং এই ভয়ানক সত্য কথাটা এখনও বুঝতে পারিনি? না, গল্পের বিখ্যাত অ্যালিসের মতন আমিও এখন "ওয়ান্ডারল্যান্ডে" ঘুরে বেড়াচ্ছি—নিজের অজ্ঞাতসারে স্বপ্নের ঘোরেই?...কিন্তু মনের এইসব দুর্ভাবনা আমি মুখে না প্রকাশ করেই বললুম, "তাহলে তুমিও পিপের ভেতরে থাকো?

—হুঁ। কাছিমরা যেমন খোলের ভেতরে থাকে, আমরাও তেমনি পিপের ভেতরে থাকি! তবে তোমাদের মতন তো তুমামাদের দেহে হাড় নেই, তাই ইচ্ছে করলেই যে কোনওরকম মূর্তি ধারণ করতে পারি! আমাদের দেহ হচ্ছে রবারের মতন—খুশি মতন কমানো বাড়ানো যায়।

‘এই দ্যাখো না’-বলেই সে গলাটাকে ক্রমেই বেশি লম্বা করতে লাগিল! দেখতে দেখতে তার গলাটা আমাদের রাস্তায় জল দেবার নলের মতন এতটা লম্বা হয়ে উঠল যে, তার মাথাটা জানলার বাইরে গিয়ে হাজির হল!

আমি ভয়ানক ভড়কে গিয়ে খুব চেঁচিয়ে বললুম, থামো থামো—আর দেখতে পারি না, আমার দম বন্ধ হয়ে আসছে!

এক মুহূর্তে তার গলা গেল আবার ছোট্ট হয়ে এবং তার মাথাটা হাসতে হাসতে রবারের বলের মতন এক লাফে আবার যথাস্থানে এসে হাজির!

সে বললে, আবার ইচ্ছে করলে আমার চোখ দুটোকে নিয়ে এই ভাবে খেলা করতে পারি—কথা শেষ হবার আগেই তার চোখ দুটো কোটর থেকে প্রায় ছয় ইঞ্চি বেরিয়ে এসেই আবার সুড়সুড় করে নিজের কোটরে ফিরে গেল!

আতঙ্কে আমার প্রাণ ধড়ফড় করতে লাগল! রূপকথার রাক্ষস-রাক্ষসীরা খুশি মতন নানারকম মূর্তি ধারণ করতে পারে, তবে কি আমি কোনও রাক্ষস রাজ্যে এসে পড়েছি? আমার মাথার চুল ও গায়ের রোমগুলো পর্যন্ত খাড়া হয়ে উঠল! এখন যে আর স্বপ্ন দেখছি না, এটুকু আমি বেশ বুঝেছি, —কিন্তু...কিন্তু...এসব কী অসম্ভব কাণ্ড!

মিনতি ভরা স্বরে বললুম, লক্ষ্মীমেয়েটি, তুমি আমন করে আর আমাকে ভয় দেখিয়ো না, তার চেয়ে আমাকে একেবারে মেরে ফ্যালো!

সে আবার খিলখিল করে হেসে উঠে বললে, ও! বুঝেছি, এসব দেখলে তুমি ভয় পাও? আচ্ছা, এই ঘাট মানছি, আর এ কাজ করব না! কিন্তু সত্যি বলছি, এতে ভয় পাবার কিছু নেই, এখানে দু-দিন থাকলেই সব তোমার অভ্যাস হয়ে যাবে! এখন তাহলে আসি।' সে চলে গেল।

মেয়েটি দেখছি ভারী গায়ে পড়া! এই একটু আগে 'আপনি' বলছিল, আর এখনই 'তুমি' বলতে শুরু করেছে! কাল থেকেই হয়তো আমাকে 'তুই-তোকারি' করবে!

হঠাৎ দরজার দিকে চেয়েই দেখি, চাঁদমুখে পণ্ডিতমশাই তিনপায়ে দাঁড়িয়ে পিপের ভিতর থেকে মুখ টিপে টিপে হাসছেন।

তিনি বললেন, কী, অমন করে জড়োসড়ো হয়ে দাঁড়িয়ে আছ যে? কমলা বুঝি তোমার সঙ্গেও দুষ্টুমি করছিল? হ্যাঁ, ও দুষ্টুমি না করে থাকতে পারে না!...তারপর? কমলার চেহারা বোধহয় তোমার খুব পছন্দ হয়েছে? তা তো হবেই! তোমাদের মতে ওইরকম চেহারাই খুব সুন্দর! কিন্তু আমরা তা বলি না। কেন বলি না জানো? আচ্ছা সংক্ষেপে আগে আমাদের ইতিহাস শোনো!

জুজু রাজ্যের ইতিহাস

পণ্ডিতমশাই বলতে লাগলেন

জানো তো, বাংলার বিজয়সিংহ সমুদ্রপথে সিংহলে এসে বাহুবলে সেখানকার রাজা হন? আমাদের পূর্বপুরুষরা ছিলেন সেই সিংহল জেতা বিজয়সিংহের সঙ্গে।

সমুদ্রে হঠাৎ ঝড় উঠে বিজয়সিংহের নৌবাহিনীর একখানা জাহাজকে বিপথে নিয়ে যায়। অনেকদিন সমুদ্রে ভাসতে ভাসতে সেই জাহাজখানা শেষটা আফ্রিকায় এসে কুল পায়।

সেই জাহাজে যিনি ছিলেন প্রধান, তার নাম হচ্ছে চন্দ্রসেন। তিনি কেবল সাহসী যোদ্ধাই ছিলেন না। নানা শাস্ত্রে তাঁর পণ্ডিত্য ছিল, অসাধারণ। বৈজ্ঞানিক রহস্য নিয়ে সর্বদাই আলোচনা করতেন। এমন সব ব্যাপার। তিনি জানতেন, তোমাদের এখনকার বড়ো বড়ো পণ্ডিতও যার কোনোই খবর রাখেন না।

মানুষের দেহ আর মনকে উন্নত করে তাকে সর্বাঙ্গসুন্দর করে তোলবার এক গুপ্ত পদ্ধতি তিনি আবিষ্কার করেছিলেন। সে পদ্ধতি এখানে ব্যাখ্যা করলেও তুমি বুঝতে পারবে না, তা বড়েই জটিল। সে রহস্য জানবার জন্যে যদি তোমার কৌতুহল হয়, তাহলে এখানকার যাদুঘরে গিয়ে দেখো।

চাহাজে যেসব সঙ্গীরা ছিল, চন্দ্রসেন তাদের নিয়েই নিজের পদ্ধিতিটিকে পরীক্ষা করতে লাগলেন। সেই পরীক্ষার ফলেই আমাদের সৃষ্টি হয়েছে!

সুতরাং বুঝতেই পারছি, আমরা একসময়ে ছিলুম তোমাদেরই মতন বাঙালি এবং সেকেলে মানুষ! কিন্তু আমরা এখন তোমাদের মতন অক্ষম আর অসম্পূর্ণ মানুষ নই। আমাদের মন দেহের চাকর নয়, আমাদের মন দেহের প্রভু! আমাদের দেহে একখানাও হাড় নেই, কারণ তা অনাবশ্যক। এই দেহ নিয়ে আমরা যা খুশি করতে পারি, —কমলা বোধহয় তার দু-একটা দৃষ্টান্ত তোমাকে না দেখিয়ে ছাড়েনি? তোমাদের মতন আমাদের brain— অর্থাৎ মগজ, খুলির ভিতরে চেপটে বন্দি হয়ে থাকে না। সে সম্পূর্ণ স্বাধীন! তাই দেহের উপরে আমাদের অবাধ অধিকার। আমার এই একখানা মুখকে আমি কতরকম করতে পারি—দাখো! (এই বলে পণ্ডিতমশাই কতগুলো এমন ভীষণ ভীষণ নমুনা দেখালেন যে, আমার সর্বাঙ্গ ছম ছম করতে লাগল!)। যখন যতগুলো দরকার, তখন ততগুলো হাত আর পা আমরা সৃষ্টি করতে পারি! (এই বলে পণ্ডিতমশাই আমার বিস্মিত চোখের সামনে দু-কুড়ি হাত পা বার করে নেড়ে চেড়ে দেখালেন!)। আমি তোমার মতন ধীরে ধীরে হাঁটতেও পারি, আবার দরকার হলে দৌড়ে মটরগাড়িকেও হারাতে পারি। আমি কতকাল বাঁচব, সেটাও আমার নিজের ইচ্ছার উপরে নির্ভর করে!

রাবণ রাজা থাকতেন লঙ্কাদ্বীপে—অর্থাৎ সিংহলে। তাঁর দশ মুণ্ড আর বিশখানা হাত ছিল। আবার দরকার হলে তিনি সাধারণ মানুষের রূপও ধারণ করতে পারতেন। রাবণ রাজার ভাই কুম্ভকর্ণের দেহ ছিল তালগাছের চেয়েও উঁচু। এসব হচ্ছে দেহের উপরে মনের প্রভুত্বের দৃষ্টান্ত।

তোমরা হচ্ছে সাধারণ মানুষ। তাই এসব ব্যাপারকে গাঁজাখুরি বলে উড়িয়ে দাও। কিন্তু এ হচ্ছে, তোমাদেরই বোকামি। রামায়ণ ও মহাভারত যাদের লেখা, তারা কোনওকালে গাঁজা খেতেন বলে প্রমাণ নেই।

খুব সম্ভব রাবণ রাজার দেশে গিয়েছিলেন বলেই চন্দ্রসেন সর্বাঙ্গ সম্পূর্ণ মানুষ সৃষ্টি করবার গুপ্ত পদ্ধতিটি আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন। তখনও সিংহলের কোনও কোনও পণ্ডিত হয়তো ওই গুপ্ত পদ্ধতি নিয়ে নাড়াচাড়া করতেন। এ পদ্ধতি এখন খালি আমরাই জানি। তুমি যদি আমাদের সঙ্গে কিছুকাল থাকে, তাহলে তুমিও হয়তো অনেক নতুন জ্ঞান অর্জন করতে পারবো!

অমল, আজ আর বেশি কিছু বলব না। একদিনে বেশি কথা শুনলে তোমার অসম্পূর্ণ ছোট্ট মগজ হয়তো গুলিয়ে যাবে। আজ এই পর্যন্ত। এসো আমার সঙ্গে!'

পণ্ডিতমশাইয়ের সঙ্গে আমি পাশের ঘরে গিয়ে হাজির হলুম। সেখানে দু-খানা জলচৌকির মতন ছোটো ছোটো টেবিলে রাশীকৃত ফলমূল সাজানো রয়েছে। পণ্ডিত তাঁর পিপে-দেহের একদিকটা মাটির উপরে বসিয়ে পা তিনখানা ভিতরে ঢুকিয়ে নিয়ে বললেন, 'বোসে অমল, খেতে বোসো। আমরা খাওয়া-দাওয়ায় বেশি সময় নষ্ট করি না।' বলেই তিনি অজগর সাপের মতন মস্ত একটা হাঁ করে মিনিট দুয়েকের মধ্যে প্রায় একঝুড়ি ফল উদারস্থ করে ফেললেন। তারপর জলপান করে বললেন, 'ব্যাস, খাওয়া তো হল-এইবারে ওঠে।'

খাওয়া হল না ছাই হল! এরা খাওয়া-দাওয়ায় বেশি সময় নষ্ট না করতে পারেন, কিন্তু দু-মিনিটে যারা দশজন লোকের খোরাক গপ গপি করে গিলে ফেলতে পারে, তাদের আর বেশি সময়ের দরকার কী? এই চাদমুখে পণ্ডিতের সঙ্গে খেতে বসলে আমাকে উপোস করে মরতে হবে দেখছি! তাড়াতাড়ি করেও দু-মিনিটে আমি দুটো আপেল পার করতে পারলুম না। কী আর করি, পণ্ডিত যখন চোখ বুজে জলপান করেছিলেন, তখন আমি, গোটাকিয়েক ফল টপ টপ করে পকেটে পুরে ফেললুম!

পণ্ডিত মুখ মুছতে মুছতে বললেন, বেশি খেলে মগজ ভোঁতা হয়ে যায়। তাই আমি নামমাত্র খাই। কিন্তু আমাদের দেশেও এমন অনেক নিরেট বোকা আছে, যারা মনে করে। বেশি খেলে দেহের তেজও বেশি হয়! এদের বুদ্ধির গলায় দড়ি। ওই যে, নাম করতে করতেই ওই দলের একটি নির্বোধ আমাদের দিকেই আসছে!

ফিরে দেখি, প্রকাণ্ড একজন পিপে-মানুষ হেলে দুলে হাঁসফাস করতে করতে এদিকেই এগিয়ে আসছে। তার পিপেটা এমন ভয়ানক মোটা যে ওর মধ্যে পণ্ডিতের মতন দু-দুজন লোকের ঠাঁই হতে পারে! তার মুখখানাও সবচেয়ে বড়ো বারকোসের মতন। কপালে গালে বড়ির মতন বড়ো বড়ো আঁচিল আর তার ঠোঁটে এমনি ন্যাকামি মাখানো হাসি যে দেখলেই গা যেন জুলে যায়! লোকটাকে মোটেই আমার পছন্দ হল না!

সে এসে একবার সবিস্ময়ে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, প্রিয় পণ্ডিতমশাই, এই বুঝি সেই জীবটা? বটে! আমি এটাকেই দেখতে এসেছি!

পণ্ডিত বললেন, এই ভদ্রলোকের নাম শ্রীঅমলকুমার সেন, নিবাস বাংলা দেশ! ভোম্বল, এর সম্বন্ধে তুমি ওরকম ভাষায় কথা কোয়ো না!

ভোম্বল অমনি সুর বদলে চোখ মটকে বললে, নিশ্চয়, নিশ্চয়! আপনার বন্ধু তো আমারও বন্ধু!...হাঁ, ভালো কথা কমলা কোথায়?

পণ্ডিত বললেন, এতক্ষণে সে বোধহয় মন্ত্রীমশাইয়ের বাড়িতে গিয়েছে। আপাতত তুমি এক কাজ করতে পারো ভোম্বল? অমলকে নিয়ে খানিকটা বেড়িয়ে আসবে?

ভোম্বল বললে, নিশ্চয়, নিশ্চয়! আপনার কথায় আমি প্রাণ দিতে পারি, এটা তো অতি তুচ্ছ ব্যাপার! আসুন অমলবাবু, আমার সঙ্গে আসুন! আপনাকে আমি যাদুঘরে নিয়ে যাব। সেখানে একটা ভালো হোটেল আছে, একটু-আধটু খাওয়া-দাওয়াও করা যাবে-কী বলেন?' বলেই সে মহা মুরুব্বির মতন আমার পিঠ চাপড়ে দিলে।

পণ্ডিত বললেন, 'সন্ধের আগেই ওকে আবার ফিরিয়ে আনা চাই। মনে রেখো, ওর ভার এখন তোমার উপরে, ওর জন্যে তুমি দায়ী হবে!' বলেই তিনি হাত-পা ভিতরে গুটিয়ে নিয়ে গড়াতে গড়াতে ঘর থেকে বেগে বেরিয়ে গেলেন।

নরডিম্ব

ভোম্বল চোখ দুটো নাচাতে নাচাতে বললে, “যখন পণ্ডিতের হুকুম, পালন করতেই হবে! অমলবাবু, তাহলে আপনি হচ্ছেন একটি মনুষ্য? আমাদের দেখে আপনার কী মনে হয়?’- বলেই সে দন্তবিকাশ করে হাসলে।

আমি জবাব দিলুম না।

সে আবার দন্তবিকাশ করে হেসে বললে, ‘আপনি গড়িয়ে গড়িয়ে হাঁটতে পারেন?’ আমি চটে গিয়ে বললুম, ‘নিশ্চয়ই পারি না! দেখতেই পাচ্ছেন আমি পিপে নাই!’

—তাহলে উপায় নেই-আমাকেও দেখছি আপনার সঙ্গে ছোটোলোকের মতন পায়ে হেঁট মরতে হবে! পায়ে হাঁটা এক ঝকমারি! হাঁপ ধরে।...আসুন, এই পথে।’

ঘরের ভিতর থেকে বেরিয়ে দেখি, একটা পথ ঢালু হয়ে নীচের দিকে নেমে গেছে। সেটা হচ্ছে সিঁড়ি! এদের সিঁড়িতে ধাপ নেই—তাই গড়িয়ে নামবার সুবিধা হয়। আমার কিন্তু একটু মুশকিল হল। ঢালু পথ দিয়ে নামতে গিয়ে দু-চার বার হুমড়ি খেয়ে পড়বার মতন হলুম। এবং শেষ পর্যন্ত টাল সামলাতে পারলুমও না। খানিকটা সড় সড় করে নেমে গিয়ে মস্ত একটা ডিগবাজি খেয়ে দাড়াম করে নীচের চাতালের উপরে আছাড় খেয়ে পড়লুম।

ভোম্বলের কিন্তু কোনোই বালাই নেই। সে হাত-পা ভিতরে গুটিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে চোখের নিমিষে নীচে গিয়ে দাঁড়াল। তারপর দন্তবিকাশ করে ন্যাকামির হাসি হেসে বললে, দেখছেন, শ্রীখোলের ভেতরে থাকার কত সুবিধে!

আমি রাগে মুখ ভার করে বললুম, আমাদের দেশে গেলে আপনিও বুঝতেন। কত ধানে কত চাল! আমাদের সিঁড়ি দিয়ে নামতে হলে আপনার খোলা ফেটে চৌচির হয়ে যেত!

ভোম্বল বললে, আপনাদের দেশে যাচ্ছে কে? অসভ্য দেশ!

আমি আর কিছু বললুম না। তার সঙ্গে বাড়ির বাহির হয়ে রাজপথের উপরে গিয়ে দাঁড়ালুম।

সে এক নতুন দৃশ্য! রাজপথের দু-ধারে সারি সারি বাড়ি—কিন্তু কোনও বাড়ির সঙ্গেই কোনও বাড়ির গড়ন মেলে না। প্রত্যেক বাড়ির উপর দিকটা খিলানের আকারে গড়া—আঁকা-বাঁকা, কিম্ভূতকিমাকার!

কলকাতার আপিস অঞ্চলে যেমন আকাশমুখো মস্ত মস্ত বাড়ি আছে, এখানেও তার অভাব নেই। কিন্তু এদেশি চ্যাঙ বাড়িগুলোর আমাদের চিলের ছাদের মতন ঢালু সিঁড়ির কথা ভেবে আমার বুক কাঁপতে লাগল! ওসব সিঁড়ি দিয়ে ওঠবার সময়ে এরা হয়তো যথেচ্ছভাবে বিশ-পঁচিশ খানা অসম্ভব ও ভূতুড়ে হাত-পা বার করে উপরে উঠে যায়, কিন্তু ওসব সিঁড়ি দিয়ে ওঠা-নাবা করতে গেলে গতির চূর্ণ হয়ে আমার মৃত্যু সুনিশ্চিত!

রাস্তায় আমাদের দেশের মতন গোলমালও নেই। পথ দিয়ে ধীরে ধীরে বা দ্রুতবেগে পিপের পর পিপে গড়িয়ে যাচ্ছে, খুব কম লোকই পায়ে হেঁটে চলছে। যারা পদব্রজে যাচ্ছে, তাদের প্রত্যেকেরই তিনখানা করে পা দেখে বোঝা গেল যে, ইচ্ছামতো পদবৃদ্ধি করতে পারলেও সাধারণত এরা তিনখানা পদই ব্যবহার করে।

গোরুর গাড়ির চাকার মতনই বড়ো অনেকগুলো চক্রও রাস্তার উপর দিয়ে বন বন করে ছুটছে! এক-এক খানা চাকা আবার এত বড়ো যে, মাপলে আট-দশ হাতের কম চওড়া হবে না! চাকাগুলো ছুটে যাচ্ছে ঠিক মটরগাড়ির বেগে। এমন কায়দায় তারা এঁকেবেঁকে ছোটো ছোটো পিপের পাশ কাটিয়ে ছুটছে যে দেখলে তারিফ করতে হয়! কিন্তু পিপেদের সঙ্গে ধাক্কা লাগলেও কোনও পক্ষ থেকেই এখানে যে আপত্তি হয় না, সে প্রমাণও পাওয়া গেল। কারণ একবার একখানা চাকা বিপরীত দিক থেকে ধাবমান একটা পিপের উপরে উঠে আবার গড়িয়ে নেমে চলে গেল, তবু কোনও পক্ষ থেকেই কোনও গোলমাল হল নাযেন এ ব্যাপারটা এত বেশি তুচ্ছ যে, লক্ষ করবার মতনই নয়!

আমার পাশের হৃষ্টপুষ্ট জীবটি-অর্থাৎ ভোম্বলদাস লকলকে জিভ দিয়ে ঠোঁটটা একবার চোট নিয়ে বললে, “কী অমলা, আমাদের দেশ দেখে তুমি যে দেখছি থ হয়ে গেলে!

অমলা! আমি খাপ্পা হয়ে বললুম, আপনি আমাকে অমলা বলে ডাকছেন যে? আমার নাম অমল।

ভোম্বল দন্তবিকাশ করে বললে, ঠাট্টা করলে চটো কেন? ও অমল। আর আমলা একই কথা!

আমি বললুম, না, অমল আর আমলা একই কথা নয়! ওরকম ঠাট্টা আমি পছন্দ করি না!

ভোম্বল বললে, 'বাপরে তুমি তো ভারি বেরসিক কাঠ গোয়ার হে? একটুতেই এত বেশি চোট কেন? তোমার মুখখানা এখন কীরকম দেখতে হয়েছে জানো? এইরকম!'— বলেই ভোম্বল তার মুখখানা বিকৃত করতে লাগল। এবং আমার চোখের সামনেই দেখতে দেখতে তার অদ্ভুত মুখখানা অবিকল আমার মুখেরই মতন হয়ে উঠল! সে যে কী প্রাণ চমকানো ব্যাপার, ভুক্তভোগী ছাড়া আর কেউ তা বুঝবে না! আমার চোখের সুমুখেই আর একজন আমি'র আবির্ভাব! শেষটা আমি আর সইতে পারলুম না, বলে উঠলুম, ক্ষান্ত হন মশাই, ক্ষান্ত হন! আমি ঘাট মানছি!

ভোম্বলের মুখ আবার ভোম্বলেরই মতন কুৎসিত হয়ে গেল। দন্তবিকাশ করে হেসে বললে, দেবরাজ ইন্দ্র যে বিদ্যার জোরে মহর্ষি গৌতমের মূর্তি ধারণ করেছিলেন, আমিও সেই বিদ্যা জানি! হ্যাঁ, আর পণ্ডিতের মেয়ে কমলাও এ বিদ্যায়। ভারি পাকা। ঐ রাজ্যে এই বহুরূপী বিদ্যায় আমাদের আর জুড়ি নেই-আমাদের মতন ভালো নকল আর কেউ করতে পারে না!...না, মিছে কথায় সময় কাটানো হচ্ছে-আমার খিদে পেয়েছে! চলে যাদুঘরে যাই! চাকা! এই চাকা!' বলেই সে এমন তীক্ষ্ণ শিস দিল যে আমার মনে হল কানের কাছে

কোথা থেকে সোঁ সোঁ করে দু-খানা মস্ত চাকা আমাদের সামনে এসে হাজির! তাদের চক্রানভির মধ্যে-অর্থাৎ মাঝখানে দুজন পিপে-মানুষ কী কৌশলে নিজেদের সংলগ্ন করে রেখেছে এবং হাতে করে পাখির দাঁড়ের মতন বেয়াড়া এক বসবার আসন ধরে আছে।—

লোকে যেমন করে ব্যাগ বা পোর্টম্যান্টে গাড়ির উপরে উঠিয়ে দেয়, ভোম্বল ঠিক তেমনি ভাবেই ধরে আমাকে সেই দাঁড় আসনে তুলে বসিয়ে দিলে! তারপর নিজেও আমার পাশে এসে বসে হেঁকে বললে, এই! যাদুঘর-শিগগির!

বোঁ করে চাকা ছুটল—কে যেন আমাকে এক হাঁচটা টান মেরে দাঁড় থেকে ফেলে দেয় আর কী! কী কষ্টে যে ঝোক সামলে নিলুম, তা আর বলবার নয়! চাকা দু-খানা ছুটিল ঠিক আমাদের পাঞ্জাব মেলের মতন, হু হু হাওয়ার তোড়ে নিশ্বাস যেন বন্ধ হয়ে আসতে লাগল। দাঁড়ের উপর বসে থাকে, কার সাধ্য!—ভেম্বলের কিন্তু কোনওই খেয়াল নেই-দন্তবিকাশ করে হাসতে হাসতে সে দিব্যি আরামেই যাচ্ছে! গাড়ির পায়ে নমস্কার!

আচমকা গাড়িখানা দাঁড়িয়ে পড়ল। এবং এবারে আমি কিছুতেই টাল সামলাতে পারলুম। না—দাঁড় থেকে ঠিকরে দশ হাত দূরে খুব নরম কী একটা জিনিসের উপর গিয়ে পড়লুম এবং পরমুহূর্তেই সে জিনিসটাও আমাকে তুলে ছুঁড়ে ফেলে দিলে।

খনখনে গলায় কে বলে উঠল, কীরকম লোক মশাই আপনি?

আমি নিশ্চয় কারুর ঘাড়ের উপরে গিয়ে পড়েছিলুম। তাড়াতাড়ি মাটি থেকে উঠে গায়ের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বললুম, আমাকে মাপ করবেন! আমি—

—আপনি কি দেখতে পাননি যে, আমি এখন আমার শ্রীখোলের ভেতরে নেই? আপনি কি চোখের মাথা খেয়েছেন? আপনি কি-ও হরি, এটা যে সেই মানুষটা!

এতক্ষণ পরে আমি একটু দম পেলুম এবং আমার চোখের ধোঁয়া ধোঁয়া ভাবটা কেটে গেল। ভালো করে তাকিয়ে দেখি, একটা পিপে মাটিতে পড়ে গড়াগড়ি দিচ্ছে।

অনুতপ্ত স্বরে বললুম, দেখুন, এরকম দাঁড়ে চড়ার অভ্যাস আমার কোনও কালেই নেই। তাই—

—আরো গেল, এ যে আমার শ্রীখোলের সঙ্গে কথা কয়! মশাই কথা কইতে হয় তো আমার সঙ্গে কথা বলুন।

তখন ডান দিকে ফিরে দেখি, পথের উপরে জেলি মাছের মতন কী একটা পড়ে রয়েছে। তার মাঝখানে একখানা থলথলে মুখ থরথর করে কাঁপছে! এবং তার চোখ দুটো ক্রোধে ও রুদ্ধ আক্রোশে আমার পানে তাকিয়ে যেন জ্বলে জ্বলে উঠছে! মুখখানা এক-এক বার ফুলছে, আবার হাওয়া বেরিয়ে গেলে ফুটবলের ব্লাডারের অবস্থা যেমন হয়, তেমনি চুপসে যাচ্ছো!

এখন ভোম্বলের হাসির ঘটা দেখে কে! হাসতে হাসতে তার চোখ দিয়ে জল ঝরছে। অনেক চেষ্টার পর হাসি থামিয়ে সে বললে, 'অমল, তুমি একেবারে ও বেচারার মাঝখানে গিয়ে ঝাঁপ খেয়েছ, আর ওর দম তাই ফুরিয়ে গেছে!...ওহে নসু! ভায়া, এ লোকটি জেনেশুনে এ কাজ করেনি, তুমি ঠান্ডা হও! আর এও বলি, রাস্তার মাঝখানে শ্রীখোল থেকে বেরিয়ে আসা তোমার উচিত হয়নি!'

নসু মুখ ভেংচে বললে, 'খুব তো মুখশাবাশি করছ, নিজে এ দশায় পড়লে টের পেতে! আমার গা-টা নদী না পুকুর, যে ও লোকটা এসে অমন করে ঝাঁপ খাবে! যাও, যাও—আমার পিলে একেবারে চমকে গেছে!' এমনি বক বক করতে করতে সে উঠে নিজের পিপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল এবং তিনখানা ঠ্যাং ও খানকয়েক হাত বার করে বারকয়েক ছুঁড়লে এবং তারপর হঠাৎ সব গুটিয়ে নিয়ে গড়গড়িয়ে পথ দিয়ে ছুটে চলল!

ভোম্বল বললে, এই হচ্ছে আমাদের যাদুঘর। যাও, তুমি ভেতরে ঢুকে চারিদিক ভালো করে দেখে এসো গে যাও! মানকে! তুই এই ভদ্রলোককে সমস্ত দেখিয়ে আন!' —এই বলে সে একদিকে এগিয়ে চলল।

ভোম্বল আমাকে 'তুমি' বলে ডাকছে, তাই আমিও বললুম, ওহে ভোম্বল, তুমি কোথায় চললে?

—হোটেলে, আর যৎকিঞ্চিৎ পেটে না দিলে চলে না! যাদুঘর দেখে-শুনে তুমি আবার আমার কাছে এসো। সে আর আমার দিকে ফিরেও তাকালে না-খাবারের গন্ধ বোধহয় তার নাকে ঢুকেছে!

আমারও পেটে এখন আগুন জ্বলছে! একবার ভাবলুম আমিও হোটেলে গিয়ে ঢুকি, কিন্তু এদেশে আমাদের টাকা পয়সা যদি না চলে, তবে খাবারের দাম দেব কেমন করে? এমনি সাত-পাঁচ ভেবে শ্রীমান মানকের সঙ্গে আমি যাদুঘরের ভিতরেই প্রবেশ করলুম। যাদুঘরের ভিতরে ঢুকে আমি যে কত রকমের অজানা জিনিস দেখলুম তা আর গুনে ওঠা যায় না! এই অদ্ভুত জীবদের স্রষ্টার নিজের হাতে আঁকা অনেকগুলো ছবিতে বুঝিয়ে দেওয়া আছে, মানুষের দেহের উপাদান থেকে কেমন করে এদের দেহ গড়া হয়েছে, কেমন করে তাদের মাংসের ভিতর থেকে হাড় বাদ দেওয়া হয়েছে, দ্রব্যগুণের মহিমায় এদের মগজের শক্তি কেমন করে বাড়িয়ে তোলা হয়েছে প্রভৃতি। সেসব এখানে অকারণে বর্ণনা করে লাভ নেই, কারণ আসল ছবিগুলো না দেখলে কেউ কিছু বুঝতে পারবেন না!

অনেকগুলো পাথরের কিম্ভূতকিমাকার মূর্তি রয়েছে। সৃষ্টির প্রথম অবস্থায় এই পিপেমানুষগুলোর চেহারা কীরকম ছিল, সেই মূর্তিগুলোর সাহায্যে তাইই দেখানো হয়েছে।

এক জায়গায় একটা যন্ত্র দেখলুম, তার নাম ‘নরডিম্ব-প্রস্ফুটন-যন্ত্র’! তার পাশে রয়েছে উটপাখির ডিমের মতন মস্ত একটা ডিম-উপরে লেখা ‘নরডিম’! দেখে আমার মাথা ঘুরে গেল বললেও কম বলা হয়!-ওরে বাবা! ঘোড়ার ডিমের কথা তো লোকের মুখে শুনেছি, মানুষের ডিম আবার কী? এর কথা তো ঠাট্টা করেও কেউ বলে না!

অনেকক্ষণ সেই ডিম আর যন্ত্রের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলুম। কিন্তু তবু কোনও হদিস না পেয়ে স্থির করলুম-নিশ্চয়ই এটা একটা বড়ো রকমের কী েতুক! যাদুঘরে এরকম গাঁজাখুরি কৌতুক থাকা উচিত নয়!

আর একটা ঘরে গিয়ে দেখলুম চন্দ্রসেনের প্রকাণ্ড প্রতিমূর্তি। চন্দ্রসেন—এই অদ্ভুত জীবদের স্রষ্ট! সে মূর্তি দেখে মনে কিছুমাত্র শ্রদ্ধার উদয় হল না। বয়সের ভারে ঝুঁকে পড়া, শীর্ণদেহের এক বৃদ্ধ-তার দুই চক্ষে ঠিক যেন হিংসা-পাগল হত্যাকারীর দৃষ্টি! দেখলেই ভয়ে বুক শিউরে ওঠে! আমার মনে হল চন্দ্রসেনের চোখদুটো যেন কুটিল ভাবে আমার দিকেই তাকিয়ে আছে! এ রাজ্যে সাধারণ মানুষের আবির্ভাব দেখে চোখদুটো যেন মোটেই খুশি নয়!

ঘরের ভিতরটা তখন অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে এসেছে। ভয়ে ভয়ে পিছন পানে তাকিয়ে দেখি, সেই মানকে বলে লোকটা চুপ করে দাঁড়িয়ে আছে।

তার সঙ্গে চোখাচোখি হতেই সে বললে, এ ঘরে আর বেশিক্ষণ থাকবেন না।

আমি বললুম, কেন?

মানকে ভয়ে ভয়ে খুব চুপিচুপি বললে, অন্ধকার হলে এ ঘরে আর কেউ আসে না।

—কেন?

একটা হাত তুলে চন্দ্রসেনের মূর্তি দেখিয়ে সে বললে, ওঁর ভয়ে!

আমি আবার মূর্তির দিকে তাকালুম। কোনও জানলার ফাঁক দিয়ে একটি ক্ষীণ আলোকের টুকরো মূর্তির ঠোঁটের উপরে এসে পড়েছে। আমার মনে হল, চন্দ্রসেনের মুখে যেন একটা রক্তপিপাসু নিষ্ঠুর হাসির রেখা ফুটে উঠেছে!

ফিরে বললুম, ওঁর ভয়ে কীরকম? ওটা তো পাথরের মূর্তি?

সে বললে, অন্ধকার হলেই ওই মূর্তি জাগ্রত হয়ে ওঠে। তখন সকলেই শুনতে পায় কে যেন ভারী ভারী পাথুরে পা ফেলে ঘরময় চলে বেড়াচ্ছে। আসুন, আমি আর এখানে থাকিব না।

আমি তার কথা বিশ্বাস করলুম না বটে, কিন্তু এই ঘরে-এমনকি যাদুঘরেও আর থাকতে ইচ্ছা হল না। একেবারে বাইরে বেরিয়ে হোটেলের দিকে গেলুম ভোম্বলের খোঁজে। সেখানে গিয়ে দেখি, ভোম্বল ততক্ষণে মহাধুমধাড়াক্কা লাগিয়ে দিয়েছে। তার খাবার টেবিলের উপরে পাঁচশ-ত্রিশ খানা থালা পড়ে রয়েছে এবং একটা ঘটিতে মুখ দিয়ে ঢক ঢাকা করে কী পান করছে।

আমাকে দেখেই ভোম্বল টেবিল চাপড়ে খাব ফুর্তির সঙ্গে বলে উঠল, এই যে আমলা! এসো, এসো, একটু ভাং খাবে এসো!

মনের রাগ কোনওরকমে সামলে বললুম, আমি সিদ্ধি ছুঁই না! সন্ধের আগে আমার ফেরবার কথা, আমাকে নিয়ে চলো!

পৌঁছে দিয়ে আসি। নইলে পণ্ডিতবুড়োটা রাগ করবে, আর তার মেয়ের সঙ্গে আমার বিয়ে দেবে না!

—মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দেবে না। মানে?

—ওহো, তুমি জানো না বুঝি? কমলার সঙ্গে আমার বিয়ের সম্বন্ধ যে স্থির হয়ে আছে!

কমলা! আমন সুশ্রী মেয়ের সঙ্গে এই বিটকেল জন্তুটার বিয়ে হবে! আশ্চর্য ভোম্বল বললে, শোনো। আমি যে ভাং খাই, পণ্ডিতবুড়োকে এ কথা বোলো না। যদি বলো, তাহলে তুমি বিপদে পড়বে! এখন চলো।

আমরা দুজনে হোটেল থেকে বেরিয়ে এলুম।

ভোম্বল বেজায় টলছিল। তাই বোধহয় তিনখানা পায়ে আর টাল সামলাতে না পেরে খান ছয়েক পা বার করে হাঁটতে লাগল। তারপর চারখানা হাত বার করে চার হাতে তালি দিতে দিতে গাইতে লাগল—

ও তার নামটি যে ভাই আমলা!

ও সে নয়কে তবু অবলা!

তাকে দাও না সবাই কানমলা—

কানমলা হো! কানমলা

কানমলা! তার নাম অমলা!

ঠ্যাং আছে তার মোটে দুটো,

মগজে তার মস্ত ফুটো,

বুদ্ধিতে তাই ডাহা ঝুটো

করো না তাকে চ্যাং-দোলা!
ও তার নাম রেখেছি। অমলা!
হয় কুপোকাৎ চড়লে গাড়ি,
ভবঘুরের নেইকো বাড়ি,
কী চেহারা! ঠিক আনাড়ি!
খোরাক খালি কাঁচকলা!
ও তার নাম রেখেছি অমলা!
ও সে নয়কে তবু অবলা!
তাকে দাও না জোরে কানমলা,
কানমলা হে! কানমলা—
কানমলা! তার নাম অমলা!

আমার এমন রাগ হতে লাগল ইচ্ছা হল, মারি তার গালে ঠাস করে এক চড়! কিন্তু হতভাগা এখন মত্ত, একে মারা না-মারা দুই-ই সমান! কাজেই মুখ বুজে তার সব অসভ্যতা সহ্য করতে হল।

আমি নতুন মানুষ হব

পরের দিন সকালে পাখির গানে আমার ঘুম ভেঙে গেল।

জানলার ধারে পুচ্ছ নাচিয়ে একটি চমৎকার রঙিন পাখি মিষ্টি সুরে গান গাইছিল।

আমাদের চেনা পৃথিবীর পাখি দেখে চোখ যেন জুড়িয়ে গেল! ভাগ্যিস, চন্দ্রসেনের মগজে এখানকার পাখিদের দেহকেও উন্নত করবার খেয়াল গজায়নি!

এমন সময়ে ঘরের ভিতরে প্রবেশ করলে সুন্দরী কমলা। তার মুখখানি কেমন যেন ম্লান ম্লান।

আমি শুধালুম, তোমার মুখ অমন কেন? অসুখ করেছে নাকি?

কমলা বললে, না! বাবা আমার ওপরে রাগ করেছেন।

কেন?

—আমি এইরকম মূর্তি ধরেছি বলে। তিনি বললেন, আমি যদি শ্রীখোলের ভেতরে না থাকি তাহলে আমার পাপ হবে। একথা কি সত্যি?

—তোমার যদি ভালো না লাগে, তবে কেন তুমি খোলার ভেতরে থাকবে?

—আমিও তাই বলি। বাবা কিন্তু বোঝেন না। বাবা ভারী একরোখা মানুষ। আচ্ছা, বাবা যে বলেন, তুমি নাকি আমাদের মতন হরেক-রকম মূর্তি ধরতে পারো না, তোমার দেহ নাকি হাড়ে হাড়ে ভরা, আর তুমি নাকি গড়াতে পারো না? এ কথা কি সত্যি?

—সত্যি।

—তোমার শ্রীখোল নেই?

—নিশ্চয়ই নেই! আমাদের দেশে খোলার ভেতরে থাকে কেবল কচ্ছপ, কঁকড়া, শামুক আর গেড়ি-গুগলিরা।

—আমি কেতবে তোমার মতন জীবের কথা পড়েছি বটে, কিন্তু এর আগে চোখে কখনও দেখিনি। আচ্ছা, তোমাদের দেশে সব মানুষই কি একরকম দেখতে?

—হ্যাঁ।

—তোমার চেহারা আমার খুব ভালো লাগে। আচ্ছা, তোমাদের দেশের মেয়েদেরও দেখতে কি আমাদেরই মতন?

—হ্যাঁ। তবে তারা তোমার মতন এত সুন্দর নয়।

আমার কথা শুনে কমলা খুব খুশি হয়ে হাসতে লাগল। জানোলা দিয়ে দূরের একখানা বাড়ি দেখিয়ে আমি জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা কমলা, ওই যে মস্ত বাড়িখানা দেখা যাচ্ছে, ওখানে কী হয়?

কমলা একবার উঁকি মেরে দেখে বললে, ও হচ্ছে স্ফুটনাগার!

—সে আবার কী?

—দুর, তুমি ভারী বোকা! কিছু জানো না! ওখানে যে ছেলেমেয়ের জন্মায়!..আমার পিঠ কট কট করছে, আমি এখন শ্রীখোলের ভেতরে ঢুকতে চললুম। আমার সে মূর্তি আমি তোমাকে দেখাব না, তাহলে তুমি আমাকেও ঠাট্টা করবে!' —পিঠে কালো কেশমালা দুলিয়ে কমলা একছুটে চলে গেল।

আমি দুই চোখ মুদে শুয়ে শুয়ে ভাবতে লাগলুম, স্ফুটনাগার আবার কাকে বলে? কমলার কথায় তো কিছুই স্পষ্ট হল না!

হঠাৎ ঘরের ভিতরে পণ্ডিতমশাই ও আর-একজনের গলা পেলুম। আমি উঠে বসতে যাচ্ছিলুম, কিন্তু তারপরেই ভাবলুম ওরা কি বলাবলি করে চুপিচুপি শোনাই যাক না!

খানিক পরেই বুঝলুম, ওরা আমার সম্বন্ধেই কথা কইছে! ওরা বোধহয় ভেবেছে, আমার ঘুম এখনও ভাঙেনি, আমি কিছুই শুনতে পাচ্ছি না!

অচেনা গলায় কে বললে, পণ্ডিতমশাই, আপনার এই নমুনাটি বেশ সরেস নয়।

পণ্ডিত বললেন, তা না হতেও পারে। কিন্তু এই নিরেস নমুনা নিয়েই আমরা যদি কেল্লা ফতে করতে পারি, তাহলে তো আমাদের সুনাম আরও বেশিই হবে! আমার ধ্রুব বিশ্বাস যে একবার অস্ত্র করলেই আমি ওর দেহকে ঠিক বদলাতে পারব।

—তারপর?

—আরও অনেক মানুষ ধরে এনে এই একই উপায়ে আমাদের জাতির জীবনীশক্তি বাড়িয়ে তুলব। এ ছাড়া আর উপায় নেই-বহু বৎসরের পুরানো হয়ে পড়েছে বলে এখানকার সকলেরই জীবনীশক্তির অবস্থা হয়ে আসছে ক্রমেই ক্ষীণ।

—অস্ত্র করবার আগে ওই লোকটাকে কি সব কথা জানানো হবে?”

‘অমরচন্দ্র, তুমি একটি আস্ত গাড়ল। আমাদের উদ্দেশ্য বুঝতে পারলে অমল মোটেই খুশি হবে না।”

—কী পদ্ধতিতে আপনি কাজ করবেন?

—প্রথমে অমলের দেহকে আমি লম্বালম্বি ভাবে ফালা ফালা করে কাটিব। তারপর দেহের সেই খণ্ডগুলোকে বাজের আগুনে তাতিয়ে হাড়গোড়, সব বার করে নেব।

এতক্ষণ শান্ত ভাবে চুপ করে সব শুনছিলুম, কিন্তু এই পর্যন্ত শুনেই আতঙ্কে আমি প্রায় চিৎকার করে উঠেছিলুম। আর কী! ওরে চাদমুখো বুড়ো রাক্ষস, তোর মনে মনে এত শয়তানি?

অমরচন্দ্র বললে, কিন্তু পণ্ডিতমশাই, মনে আছে তো, গেল বছরে সেই তুর্কি লোকটার উপরে অস্ত্রাঘাত করে আপনি বিফল হয়েছিলেন? সেই থেকে মহারাজা হুকুম দিয়েছেন, এ রাজ্যে কেউ আর এরকম পরীক্ষা করতে পারবে না?

—হ্যাঁ। কিছুই আমি ভুলিনি। কিন্তু আমি কাজ সারব খুব লুকিয়ে। তারপর যদি সফল হই, মহারাজা আর আমার উপরে রাগ করতে পারবেন না। সেবারের পরীক্ষা ব্যর্থ হয়েছিল বলেই তো অত গোলমাল হয়!

—এখানকার অনেক পণ্ডিতও আপনার শত্রু, এ কথাটাও মনে রাখবেন! আর রাজসভায় ভোম্বলদাসের খুবই পসার, সে-ও আপনার বিশেষ বন্ধু নয়!

পণ্ডিত বললেন, সবই আমার মনে আছে। যেদিন অস্ত্র করব, তুমি হাজির থাকবে তো?

—নিশ্চয়! প্রমোদকেও নিয়ে আসব।

—হাঁ, তাকেও দরকার হবে বই কি, —ছুরি চালাতে ছোকরা খুব মজবুত!

অমরচন্দ্র বললে, ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি, আপনার এবারকার পরীক্ষা যেন সার্থক হয়-চন্দ্রসেনের প্রেতাত্মা যেন আমাদের সাহায্য করেন!

তারপর পায়ের শব্দে বুঝলুম, দুই শয়তান ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

হুঁ, তাহলে আমার দেহকে লম্বালম্বি ভাবে ফালাফালা করে কেটে, বাজের আগুনে তাতিয়ে, হাড়গোড় বার করে নিয়ে নতুন এক পরীক্ষা করা হবে? ওঃ, কী সুমধুর কথা রে, শুনে অঙ্গ যেন জল হয়ে গেল!

আমি ভয় পেয়েছি? ধোৎ, ভয় তো খুব ছোটো কথা, আমার বুকটা এরই মধ্যে কুঁকড়ে যেন শুকনো চামড়ার মতন শক্ত হয়ে উঠেছে!

এমন সময়ে ঘরের ভিতরে আবার পায়ের শব্দ! ইনি আবার কোন অবতার? এখানে এসে বুক ধড়াস ধড়াস করেই প্রাণটা বেরিয়ে যাবে দেখছি! সর্বদাই নতুন নতুন বিপদের ভাবনায় মনটা অস্থির হয়ে আছে। যে সৃষ্টিছাড়া দেশ!

কান পেতে মটকা মেরে পড়ে রইলুম। তারপরেই ভোম্বলদাসের ভরাট ভারিকে গলায় শুনলুম, আরে ও কী! ওহে আমল, তোমাদের দেশের লোকেরা কি এত বেলা পর্যন্ত বিছানায় কত হয়ে থাকে?

আমি উঠে বসে নির্বক হয়ে রইলুম—ভোম্বল কালকে যে-গানটা গেয়েছিল, সেটা এখনও আমি ভুলতে পারিনি। আমার নাম অমলা? আমায় দেবে কানমলা? বটে!

ভোম্বল তার কাতলা মাছের মতন ড্যাবডেবে চোখে আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে, পারলে যে, আমি তার উপরে একটুও খুশি নই। সে আমার কাছ ঘেঁষে দাঁড়িয়ে বললে, আমল! ভায়া! কাল সন্ধের সময়ে আমি কেঁকের মুখে একটা গান গেয়ে ফেলেছিলাম। তা ভাই, বন্ধুত্ব থাকলে আমন হয়েই থাকে। তুমি কিছু মনে কোরো না।

আমি নিজের মুখখানা আরও বেশি গোমড়া করে তুললুম। আর সত্যি বলতে কী, এই ভূতুড়ে জন্তুটা আমাকে তার বন্ধু মনে করে শুনে আমার রাগ যেন আরও বেড়ে উঠল! আমি হব। এইসব অপরূপ চেহারার বন্ধু? তা আর জানি না-কচুপোড়া খাও!

আমি এখনও কথা কইলুম না দেখে ভোম্বল আরও দমে গিয়ে বললে, হাঁ ভাই আমল, তুমি কি সত্যি সত্যি আমাকে মাপ করবে না? দ্যাখো, এই আমি আট হাত বার করলুম! আট হাত জোড় করে আমি মাপ চাইছি। এমন কাজ আর কক্ষনও করব না! বলো তো আমি চার-পাঁচটা নাক বের করে চার-পাঁচটা নাকে খত দেব!

ধা করে আমার মাথায় এক বুদ্ধি এল! আমি বেশ বুঝলুম ভোম্বলের সিদ্ধি খাওয়ার কথাটা পণ্ডিতের কানে তুলে দিলে পাছে কমলার সঙ্গে তার বিয়ের সম্বন্ধটা ভেঙে যায়, সেই ভয়েই সে আমার কাছে এত কাকুতি-

মিনতি করছে! নইলে মনে মনে সে নিশ্চয়ই আমাকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না! হাতে যখন পেয়েছি, তখন আর একে হাতছাড়া করা নয়! এই ভীষণ শত্রুপুরীতে একে দিয়েই কাজ করিয়ে নিতে।—অর্থাৎ কাঁটা দিয়ে কাঁটা তুলতে হবে।

কাজেই এইবারে আমি মুখ খুলে বললুম, ওরকম গান তুমি আর কখনও গাইবে না?

—না, না, না! এই তিন সত্যি!

—আচ্ছা, এবারের মতন তোমাকে মাপ করা গেল!

—কালকের কথা কারুকে বোলো না?

—না।...কিন্তু একটা কথা জিজ্ঞাসা করি। তোমার কি রাজসভায় যাতায়াত আছে?

—খুব আছে! রাজা যে আমাকে বড়ো ভালোবাসেন।

—আচ্ছা ভোম্বল, তুমি অমরচন্দ্রকে চেনো?

—খুব চিনি! কিন্তু একথা জিজ্ঞাসা করছি কেন?

—তুমি বোধহয় ওই অমরচন্দ্র আর আমাদের পণ্ডিতকে দেখতে পারো না?

ভোম্বলের মুখ শুকিয়ে গেল। চারিদিকটা একবার দেখে নিয়ে ভয়ে ভয়ে বললে, এ কথা তুমি জানলে কেমন করে?

আমি বললুম, যেমন করে হোক জেনেছি। আচ্ছা ভোম্বল, জ্যান্ত মানুষের দেহ নিয়ে ছুরি দিয়ে কাটাকুটি করা কি ভালো?

ভোম্বল বললে, কে কাটছে, আর কাকে কাটছে, তা না জেনে মত দি কেমন করে? এই ধরো, যদি কেউ বলে যে আমি বেঁচে থাকতে থাকতেই ছুরি দিয়ে কেউ আমার দেহ ব্যবচ্ছেদ করবে, তাহলে আমি এমন চেঁচিয়ে আপত্তি করব যে আকাশ ফেটে যাবে। কিন্তু তোমার দেহ ব্যবচ্ছেদ করলে আমি আপত্তি না করতেও পারি!

আমি চোখ রাঙিয়ে বললুম, বটে, বটে! তাই নাকি?

থতমত খেয়ে ভোম্বল বললে, না ভাই, আমি ঠাট্টা করছিলাম!

—এ ঠাট্টাটা তোমার কালকের গানের চেয়েও খারাপ।

—যাইই বলে ভাই, তুমি ভারী বন্দরসিক! ঠাট্টা বোঝে না। এ দেশের লোকেরা খুব ঠাট্টা বোঝে। আমি একবার ঠাট্টা করে একজনের চারটে হাত কেটে নিয়েছিলুম। সে কিছু বলেনি।

—বলবে কেন? চারটের জায়গায় তার আবার আটটা নতুন হাত গজিয়ে উঠেছিল!

—হ্যাঁ, এ কথা সত্যি বটে।...কিন্তু দ্যাখো অমল, তোমার আজকের কথা শুনে আমার আর একটা কথা মনে পড়ে গেল। কিছুদিন আগে একটা তুর্কি পথ ভুলে আমাদের দেশে এসে পড়েছিল। পণ্ডিতমশাই সেই তুর্কিটার জ্যান্ত দেহ নিয়েই কাটাকুটি করেছিলেন।

এর সঙ্গে যেন আমার নিজের কোনও সম্পর্কই নেই, এমনি উদাসীন ভাবে আমি বললুম, কেন?

—কেন, তা ঠিক জানি না। তবে গুজবে শুনেছিলুম, আমাদের চেয়েও নাকি নতুন একরকম মানুষ তৈরি করবার চেষ্টা হচ্ছিল।

আমি শিউরে উঠে বললুম, তারপর?

—নতুন মানুষ তৈরি হল না ছাই হল! মাঝখান থেকে সেই তুর্কি বেচারাই দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে মারা পড়ল! সেই থেকে এখানে আইন হয়েছে, যার দেহ কাটাকুটি করা হবে, কাটবার আগে তার নিজের মত না নিলে চলবে না।

একটা অস্বস্তির নিশ্বাস ফেলে বাঁচলুম, বুকের উপর থেকে মস্ত একটা বোঝা নেমে গেল! পণ্ডিত যদি খুব আদর মাখা মিষ্টি সুরেও বলেন—অমল, তুমি লক্ষ্মছেলে। আমি তোমার দেহখানি লম্বালম্বি ভাবে ছুরি দিয়ে কেটে ফালা ফালা করতে চাই। আশা করি আমার এ অনুরোধ তুমি রাখবে।'—তখন আমি নিশ্চয়ই বলব না যে, আপনার আদেশ আমি মাথায় পেতে নিলুম! তবে আর দেরি কেন? দয়া করে ছুরি উচিয়ে এগিয়ে আসুন, আমি ধন্য হই!

ভোম্বল বললে, দ্যাখো, আজ ক-দিন ধরে একটা ব্যাপার লক্ষ করছি! তুমি যার নাম করলে, ওই অমরা-ব্যাটা আর পণ্ডিত প্রায়ই একসঙ্গে কী গুজগুজ করে। ওরা বোধহয় আবার কোনও শয়তানি করবার চেষ্টায় আছে!

আমি মনের ভাব লুকিয়ে বললুম, না না, আমাদের পণ্ডিতমশাই খুব সাধু লোক! দয়ার শরীর!

—হেঃ, সাধু লোক! দয়ার শরীর! তুমি তাহলে লোক চেনো না! জুজুবুড়ো-জুজুবুড়ো, পণ্ডিত হচ্ছে, একটি জুজুবুড়ো!...যাক সে কথা। আজ তুমি বেড়াতে যাবে নাকি?

—আবার!

—ভয় নেই! আজি আর আমি হোটেলেও যাব না-গান-টানও গাইব না!

তবে কোথায় যাবে?

—মন্ত্রীসভায়। সেখানে আজ তর্ক হবে।

—আচ্ছা, পণ্ডিতমশাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখব। তার মত নেওয়া চাই তো!

আবার নরডিম্ব

বৈকালে আমরা যখন চা পান করি, এরা তখন লঙ্কার শরবত খায়! পণ্ডিতমশাই বলেন, পৃথিবীর সবটাই যে সুখের নয়, এ সত্য মনে রাখবার জন্যেই লঙ্কার ঝাল। শরবিতের ব্যবস্থা।

পৃথিবীতে দুঃখ যে কত, জুজু রাজ্যের জুজুদের পাল্লায় পড়ে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছি। তাই ঝাল শরবত পান করে সে দুঃখ আরও বাড়াবার চেষ্টা আমি কোনওদিন করিনি।

আজ বৈকালে ঝাল-শরবতের মহিমায় কমলা যখন হা হু করছিল, সেই সময়ে তার সঙ্গে আমার দেখা হল।

কমলা বললে, আজ নীল শাড়ি পরে আমাকে কেমন দেখাচ্ছে?

আমি বললুম, চমৎকার।

হঠাৎ সে জিজ্ঞাসা করে বলল, ও অমলবাবু! তোমাদের দেশের খোকা-খুকিদের কেমন দেখতে?

আমাদের খোকা-খুকিদের একটু বর্ণনা দেবার চেষ্টা করলুম।

কমলা বললে, তোমার নিজের কোনও খোকা-খুকি আছে?

না।

কমলা দুঃখিত মনে বললে, আমারও নিজের কোনও খোকা-খুকি নেই! পাঁচশ বছর বয়স না হলে কেউ এখানে খোকা-খুকু কিনতে পারে না।

আমি বিস্ময়ে খানিকক্ষণ বোবা হয়ে রইলুম। তারপর বললুম, তোমরা খোকা-খুকু কেনো?

—হ্যাঁ। খোকা-খুকুর বয়স যত কম, তার দামও হয় তত বেশি। আমার বাবা আমাকে দুই বৎসর বয়সে কিনেছিলেন।

এমন সময়ে পণ্ডিত এসে হাজির। আমাদের কথাবার্তা এইখানেই থেমে গেল। মনে মনে ঠিক করলুম, ভোম্বলের সঙ্গে দেখা হলে আসল কথা জেনে নিতে হবে। এই খোকা-খুকুর ব্যাপারে একটা কিছু রহস্য আছে!

ভোম্বল যথাসময়েই এলো। মন্ত্রণাসভায় যাবার পথে তাকে জিজ্ঞাসা করলুম, আচ্ছা! কমলা যে বলছিল দু-বছর বয়সের সময়ে তার বাবা তাকে কিনেছেন, এ কথার মানে কী?

ভোম্বল বললে, মানে তো খুবই সোজা! বুঝেছি—কোথায় তোমার খটকা লেগেছে!...তবে শোনো। চন্দ্রসেন যখন আমাদের সৃষ্টি করলেন, তখন ভেবে দেখলেন যে, সাধারণ দুর্বল মানুষরা যেভাবে জন্মায় সেভাবে আমরাও জন্মালে আমাদের সকলকার শক্তি ঠিক সমানভাবে বাড়বে না। এই দ্যাখো না, তোমাদের একই পিতা-মাতার পাঁচটি সন্তানের শক্তি আর বুদ্ধি একরকম হয় না। চন্দ্রসেন তাই স্থির করলেন, আমরা ডিম পাড়ব।

আমি যেন নিজের কানকে বিশ্বাস করতে পারলুম না—

ডিম? তোমরা ডিম পাড়বে?

—হ্যাঁ। আমরা ডিম পাড়ি। পড়বার পর প্রত্যেক ডিমটিকে বৈজ্ঞানিক উপায়ে পরীক্ষা করা হয়। যেসব ডিম নিরেস, অর্থাৎ খারাপ, সেগুলোকে নষ্ট করে ফেলা হয়। ভালো ডিমগুলোকে বেছে 'স্ফুটনাগারে' নিয়ে গিয়ে যত্ন করে রাখা হয়। ডিম সেইখানে ফোটে।

—কেন? যাদের ডিম তারাই ফোটায় না কেন?

—তাহলে বেআইনি কাজ করা হবে। যেসব পুরুষ আর নারী নিজেদের ডিম লুকিয়ে রাখে, তারা কড়া শাস্তি পায়।

—যেসব পুরুষ আর নারী?

—হ্যাঁ। এদেশে পুরুষ আর নারী দুয়েরই ডিম হয়।

—বলো কী! এখানে পুরুষরাও ডিম পাড়ে?

—নিশ্চয়ই পাড়ে!

—তারপর?

—ওই সব ডিম ফোটবার পরেও খোকা-খুকিদের ‘স্কুটনাগারে’র ভেতরেই লালনপালন করা হয়। তারপর যখন আমাদের সন্তান পালন করবার মতন বয়স হয়, তখন আমরা খোকা বা খুকিকে কিনে বাড়িতে নিয়ে আসি।

আমি সব শুনে এতটা হতভম্ব হয়ে গেলাম যে, মন্ত্রণাসভায় পৌঁছবার আগে আর কোনও কথাই কইতে পারলুম না।

মন্ত্রণাসভার বাড়িখানা খুবই প্রকাণ্ড। গোল বাড়ি। ঢোকবার মুখেই কয়েকজন সেপাই বা দারোয়ান আমাদের জামাকাপড় ভালো করে হাতড়ে দেখলে এবং যা-কিছু সন্দেহজনক বা আপত্তিকর বলে মনে করলে, আমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিয়ে বললে, যাবার সময়ে চেয়ে নিয়ে যেয়ো!

ভোম্বলকে শুধলুম, এ আবার কী নিয়ম?

ভোম্বলদাস দন্তবিকাশ করে হেসে সংক্ষেপে বললে, মন্ত্রণা সভাকে প্রজারা বেশি ভালোবাসে না।

বড়ো হলঘরটার ভিতরে গিয়ে আমরা যখন ঢুকলুম তখন সেখানে লোকজন ছিল নাকেবল মঞ্চের উপরে বসে একটিমাত্র পিপে নাক ডাকিয়ে আরামে নিদ্রা দিচ্ছিল।

পিপের সামনেই চকচকে পিতলের একটি নলচে।

ভোম্বল বললে, ওই নলচের সাহায্যে শান্তিরক্ষা করা হয়। ওর ব্যবহার আজকেই তুমি বোধহয় দেখতে পাবে।

হলঘরটার বিশেষ বর্ণনা দেবার দরকার নেই। ঘরের মেঝেটি মাঝখান থেকে পাক খেয়ে উপরে উঠে গেছে—এইমাত্র তার বিশেষত্ব। সমস্ত সভাস্থলের মধ্যে কোথাও একখানা চেয়ার দেখা গেল না। চেয়ারের এখানে কোনও কাজ নেই। পিপেরা আসে, পিপের তলার দিকটা মাটিতে রেখে বসে পড়ে। কোনও ল্যাঠা নেই!

ঘুমন্ত পিপেটা আচম্বিতে জেগে উঠে ঢং করে একবার কাঁসর বাজালে। পরমুহূর্তে দুমদাম করে চারিদিককার অনেকগুলো দরজা খুলে গেল এবং দলে দলে পিপে হুড়মুড় করে ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ে যে যার নির্দিষ্ট জায়গায় গিয়ে আসন গেড়ে বসল। হট্টগোলে কান পাতা দায়!

মঞ্চের পিপেটা আবার ঢং করে কাঁসর বাজিয়ে বললে, সভার কাজ আরম্ভ হোক!! —

অমনি এক সঙ্গে ডজনখানেক পিপে দাঁড়িয়ে উঠে হাত-পা নেড়ে ও মুখভঙ্গি করে চ্যাঁচাতে লাগল। তারা যেই থামল, অমনি আবার নতুন একদল পিপে লাফিয়ে উঠে গোলমাল শুরু করলে ।

ভোম্বলের ভাব ও মাথা নাড়া দেখে আন্দাজ করলুম, পিপেরা যা বলছে সে তা বেশ বুঝতে পারছে। আমি কিন্তু সেই হ-য-ব-র-ল শুনে কোনও অর্থই আবিষ্কার করতে পারলুম না ।

বললুম, কখন তর্ক শুরু হবে? ভোম্বল বললে, তোমার মতন হাঁদগঙ্গারাম আমি আর একটিও দেখিনি। ওই তো তর্ক চলছে।

—এই তর্ক! কিন্তু ওরা যে সবাই একসঙ্গে কথা কইছে!

—হ্যাঁ, একসঙ্গে কথা কইবে না তো কী করবে? একসঙ্গে কথা না কইলে ওরা কি সবাই আলাদা আলাদা করে কথা কইবার সময় কখনও পাবে?

—কিন্তু ওই হট্টগোলে কী করে ওরা পরস্পরের কথা বুঝতে পারে?

—বোঝাবার কোনও দরকার নেই তো!

—তাহলে রাজ্য চলবে কেন?

আমার দিকে খুব একটা দয়ার দৃষ্টিতে তাকিয়ে ভোম্বল বললে, তোমার বুদ্ধি দেখছি ভারী কাঁচা! এও বোঝে না, প্রত্যেক সভ্য যখন তার নিজের দলের জন্যেই ভোট দেয়, তখন তার কথা বোঝা না গেলেও ক্ষতি নেই!

—তাহলে বাজে কথা কয়ে মিছে তর্ক করবার দরকার কী?

—আচ্ছা আহাম্মকের পাল্লায় পড়লুম। যা-হোক! ওহে বাপু, কথাই যদি না কইবে, তবে সভ্য হয়ে লাভ কী?

—তাহলে পরস্পরের কথা শুনতে না পেলেও চলে?

—নিশ্চয়! ওরা অন্যের কথা শুনতে চায় না, নিজেদের কথাই শোনাতে চায়! সেইজন্যেই ওরা সভ্য হয়েছে!

মঞ্চের পিপের নাক এই গোলমালের সময়ে রীতিমতো গর্জন করছিল। হঠাৎ আবার জেগে উঠে সে কাঁসর বাজালে। অমনি যেখানে যত পিপে সবাই একসঙ্গে চ্যাচাতে চ্যাচাতে একদিকে ছুটে গেল।

আমি বললুম, ও আবার কী?

ভোম্বল বললে, ওরা ভোট দিচ্ছে।

আচম্বিতে আর-একদিকে দুই দলের ভিতরে বিষম দাঙ্গা শুরু হয়ে গেল। মঞ্চের পিপে বোধহয় আবার ঘুমোবার চেষ্টায় ছিল, কিন্তু দাঙ্গাহাঙ্গামা দেখেই সে অত্যন্ত সজাগ হয়ে লাফিয়ে দাঁড়িয়ে উঠল! তারপর যেদিকে দাঙ্গা হচ্ছে, সামনের পিতলের নলচের মুখটাকে সেইদিকে ফিরিয়ে কী একটা টিপে দিলে। একটা ছোটো গোলা দাড়াম করে যথাস্থানে পড়ে ফেটে গেল! দেখলুম, তিনজন লোক মাটির উপরে গিয়ে পড়ল—তখন তাদের আর পিপে বলে চেনবারই জো নেই! দেহগুলো ভেঙে চুরে তাল পাকিয়ে বা গুড়ো হয়ে গেছে!

ভোম্বল বলে উঠল, ওই যাঃ! বুড়ে দেবেনের গতির চুরমার হয়ে গেল দেখছি!" সমস্ত চ্যাচামেচি ও হুড়োহুড়ি একেবারে ঠান্ডা! আমি সভয়ে বললুম, হ্যাঁ ভোম্বল, তাহলে সত্যিই কি ওরা মারা পড়ল?

ভোম্বল বললে, তা পড়ল বই কি! তা ছাড়া শান্তিরক্ষার আর কোনও উপায় ছিল না যে! দোষ তো দেবেনেরই! প্রতিবারেই সে একটা না একটা হাঙ্গাম না করে ছাড়বে না! এইবারে বাপধন সায়েস্তা হলেন! কিন্তু ও কী! অমল, তোমার কি হঠাৎ কোনও অসুখ করল?

আমি বললুম, তোমাদের মন্ত্রণাসভাকে নমস্কার করছি। আমাকে বাইরে নিয়ে চলো।

বিপদ মূর্তিমান

মন্ত্রণাসভার বিশ্রী ব্যাপারটা দেখে আমার প্রাণ-মন কেমন নেতিয়ে পড়েছিল। বাসায় ফিরে এসেও কিছুই ভালো লাগল না।

দেয়ালের গায়ে একখানা বেহালা টাঙানো ছিল, হঠাৎ তার দিকে আমার নজর গেল। অন্যমনস্ক ভাবে বেহালাখানা নামিয়ে নিয়ে, তারগুলো বেঁধে একলাটি বসে বাজাতে লাগলুম।

একে তো এক উটকো সৃষ্টিছাড়া দেশে এসে প্রায় বন্দির মতনই আছি, তার উপরে শিয়রে সর্বদাই খাড়া ঝুলছে, খুনে পণ্ডিত কখন যে আমার দেহ ব্যবচ্ছেদ করতে চাইবে কিছুই বলা যায় না, কাজেই এ রকম মন নিয়ে আমি যে নিজের অজান্তে খুব একটা দুঃখের সুর বাজাব, তাতে আর সন্দেহ কী?

অনেকক্ষণ পরে যখন থামালুম, হঠাৎ একফোঁটা গরম জল আমার গলার উপরে এসে পড়ল!

দুই চোখ ভরে কান্নার জল উপচে পড়ছে! আমি এমন তন্ময় হয়ে ছিলুম যে, কখন সে ওখানে এসে দাঁড়িয়েছে, একটুও টের পাইনি!

আমি আশ্চর্য হয়ে বললুম, কমলা, কমলা! তুমি কাঁদছ কেন?

দুঃখের সুর বাজাচ্ছিলে কেন? আমার যে কান্না পেল!

দাও! তুমি একটি গান গাও, আর আমি তার সঙ্গে বাজিয়ে যাই। গাইবে?

কমলা বললে, হুঁ, তা কেন গাইব না? শোনে—

আকাশের চাঁদ-মুখ
ভেসে চলে নদীজলে
বাতাস কনেতে এসে
'কত ভালোবাসি' বলে।
নীল-লাল মুখ তুলি
দুলে দুলে ফুলগুলি
আতর-স্বপন দেখে
ঝরে পড়ে দলে দলে।
অচেনা গানের পাখি
আমারে বলিল ডাকি—
'হাসো-গাও! যতদিন
আছা ভাই, ধরাতালে'!'

গান শেষ হলে পর বললুম, কমলা! তোমার কী মিষ্টি গলা! সেদিন ভেম্বলের গান শুনে তোমাদের দেশের গানে অরুচি ধরে গিয়েছিল—

কমলা বললে, সে তোমাকেও গান শুনিয়েছিল নাকি! ওই তো তার রোগ! সবাইকে তার গান না শুনিয়ে ছাড়বে না! নিজেকে মস্ত ওস্তাদ মনে করে, ভাবে, সারা দুনিয়া তারই গান শোনবার জন্যে কান খাড়া করে আছে! আমাকেও মাঝে মাঝে জোর করে ধরে বসিয়ে গান শোনায়-বাব্বাঃ! সে যে কী কাণ্ড! যেন তিনটে প্যাচা, দুটো গাধা আর একটা হুলো বেড়াল একসঙ্গে ঝগড়া করছে! গান শেষ হলে আবার জিজ্ঞাসা করা চাই—ভালো লাগল তো'? কিন্তু তার গান ভালো বললেই বিপদ বেশি! আমি যদি বলি—ভয়ংকর ভালো লাগল', তাহলে আর রক্ষে নেই, অমনি আবার তানপুরো ঘাড়ে করে বলে 'তাহলে আর একটা এর চেয়েও ভালো গান শোনো!'

আমি হেসে ফেলে বললুম, না কমলা, ভোম্বল আমার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছে, আমাকে সে আর কখনও গান শোনাবে না।

কমলা বললে, অমলবাবু, তাহলে মানতেই হবে যে, ভগবান তার মাথায় সুবুদ্ধি দিয়েছেন!

আমি বললুম, আচ্ছা কমলা, তুমি আমাকে অমলবাবু বলো কেন, দাদা বলতে পারো না?

—দাদা বললে তুমি যদি রাগ করো?

—কেন রাগ করব? আমি যে তোমাকে ঠিক ছোটো বোনটির মতন দেখি!

কমলা বললে, এ কথা শুনে আমার ভারী আহ্লাদ হল! মাঝে মাঝে মনে হয়, আমি যদি তোমাদের মতন হতুম!

—কেন কমলা, তুমি তো ঠিক আমাদেরই দেশের মেয়ের মতন দেখতে?

—না, এটা তো আমার নকল দেহ! যাদুঘরে এইরকম মেয়ের ছবি দেখে আমার ভারী ভালো লেগেছিল, তাই তো আমি শখ করে প্রায়ই এইরকম মূর্তি ধরি। কিন্তু এই নকল দেহ নিয়ে বেশিক্ষণ থাকতে তো পারি না, আমাদের হাড় নেই বলে খানিকক্ষণ পরেই কষ্ট হয়, তখন তাড়াতাড়ি আবার সেই বিশ্রী শ্রীখোলের ভেতরে গিয়ে ঢুকি! চন্দ্রসেন আমাদের দেহ বদলে ভালো কাজ করেননি! এই যে এখন আমার চেহারা তোমার ভালো লাগছে, আমাকে তুমি নিজের বোনের মতন দেখছ, একটু পরে আমাকে সেই শ্রীখোলের ভেতরে দেখলে তুমিই হয়তো ঘেন্নায় মুখ ফিরিয়ে নেবে। কেমন, এ কথা কি সত্যি নয়?

আমি বললুম, ঘেন্না নয় কমলা, তবে ওরকম চেহারা দেখবার অভ্যাস নেই বলে অবাক হতে হয় বটে।

—না, এ তুমি আমার মন রাখা কথা বলছ! আমি তোমার চোখের ভাব দেখেছি, তুমি খালি অবাক হও না, ভয় পাও, ঘেন্না করো

—কমলা, তুমি কি জানো, কেবল চন্দ্রসেন নন, একালেও তোমার বাবা আবার একরকম নতুন মানুষ তৈরি করতে চান?

—না। তবে আজকাল বাবার মুখ দেখে আমার কেমন একটা সন্দেহ হচ্ছে!

—কী সন্দেহ?

—কিছুকাল আগে বাবা এক তুর্কির দেহে ছুরি চালিয়ে চালিয়ে সে অভাগাকে মেরে ফেলেছিলেন! সেই সময়ে তাঁর মুখের ভাব যেরকম হয়েছিল, আজকাল তাঁকে দেখলে তাঁর সেই মুখের ভাব আমার মনে পড়ে।

—কমলা, তাহলে শোনো। তুমি আমার বোনের মতন। তোমার কাছে আমি কিছু লুকব না'-বলে সেদিন পণ্ডিত আর অমরচন্দ্রের ভিতরে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল সমস্তই আমি কমলার কাছে প্রকাশ করলুম।

কমলা প্রথমটা স্তম্ভিতের মতন স্তব্ধ হয়ে রইল। তারপর উত্তেজিত স্বরে বললে, উঃ, বাবা এত নিষ্ঠুর? আবার তিনি তোমাকে হত্যা করতে চান? কিন্তু তোমার কোনও ভয় নেই, আমি তোমাকে সাহায্য করব! এখন এদেশে জ্যান্ত মানুষের দেহে ছুরি চালানো বেআইনি! আমি এখানকার এমন অনেক লোককে চিনি যারা বাবাকে এরকম পাপকাজ কিছুতেই করতে দেবে না। এই ষড়যন্ত্রের কথা আমি নিজে গিয়ে তাদের কাছে বলে আসব!

আচম্বিতে পিছন থেকে ক্রুদ্ধ গভীর স্বরে শোনা গেল, যা শুনলুম, তা কি সত্য?

চমকে ফিরে সভয়ে দেখলুম, দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছেন পণ্ডিতমশাই! তাঁর দুই চক্ষে দু-দুটো আগুনের শিখা! এবং সেই অগ্নিময় চোখদুটো একবার কোটরের বাইরে পাঁচছয় হাত বেরিয়ে আসছে, তারপর আবার কোটরের ভিতরে সেদিয়ে যাচ্ছে। এটা বোধহয় পিপে-মুলুকে বিশেষ রাগের লক্ষণ!

কমলার পিপে

যে ভয়ানক দিনটাকে আজ কয়দিন মন থেকে কিছুতেই মুছে ফেলতে পারছিলুম না, চোখের সামনে এখন সে যেন মূর্তি ধরে দেখা দিলে!

কমলার কথা পণ্ডিত শুনতে পেয়েছে! আমি যে তাদের ষড়যন্ত্র ধরে ফেলেছি, এটাও সে জানতে পেরেছে! আর আমার বাঁচোয়া নেই!

পণ্ডিতের এখনকার চেহারা দেখে ভেম্বলের কথা মনে পড়ল। জুজুবুড়ো-জুজুবুড়ো! তার মুখে-চোখে এখন পিশাচের ভাব ফুটে উঠেছে।

খুব টিটকিরি দিয়ে কমলার দিকে ফিরে পণ্ডিত বললে, মেয়ে আমার দেবী হয়েছেন! বাবাকে পাপ কাজ করতে দেবেন না! একটা বিদেশি জন্তুকে বাঁচাবার জন্যে পাঁচজনকে সব জানিয়ে আমার সর্বনাশের চেষ্টা করবেন! আহাহাহা-মারি মরি!

কমলা জবাব না দিয়ে মাথা হেঁট করলে। তার মুখ তখন ভয়ে সাদা হয়ে গেছে! পণ্ডিত বললে, যখন তখন তুই ওই সেকেলে মানুষগুলোকে নকল করিস বলে বরাবরই আমার সন্দেহ ছিল যে, তোর বুদ্ধির গোড়ায় গলদ আছে! কিন্তু তুই যে এতটা অধঃপাতে গিয়েছিস তা আমি বুঝতে পারিনি! জানিস, এ রাজ্যে বাপ-মায়ের অবাধ্য হলে ছেলেমেয়েরা কী কঠিন শাস্তি পায়?

কমলা বললে, কিন্তু অমলদাদাকে তুমি কিছুতেই খুন করতে পারবে না!

দাঁত-মুখ খিঁচিয়ে পণ্ডিত বললে, কী? অমলদাদা! ওই সেকেলে জড়ভরতটাকে তুই আমার সামনে দাদা বলে ডাকছিস! রোস,-চুপ করে দাঁড়া! তোর সব ভিরকুটি আজকেই ঠান্ড করে দেব!

পণ্ডিত উগ্রদৃষ্টিতে অগ্রসর হয়ে কমলার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়ে কীরকম অদ্ভূত ভঙ্গিতে দুটো হাত নাড়তে লাগিল—সঙ্গে সঙ্গে কমলার মুখে-চোখে ও সর্বাঙ্গে কেমন একটা তীব্র যাতনার ঢেউ বয়ে গেল,—তার ভাব দেখে আমাদের মনে হল, সে যেন কী একটা অদৃশ্য বিভীষিকাকে ঠেকিয়ে রাখবার জন্যে চেষ্টা করছে।—প্রাণপণে চেষ্টা করছে!

পরমুহূর্তেই স্তম্ভিত দৃষ্টিতে দেখলুম, কমলার দেহ আকারহীন থলথলে মাংসপিণ্ডের মতন মাটির উপরে গড়াগড়ি দিচ্ছে! যাদুঘরে যাবার দিনে চাকা-গাড়ি থেকে জেলিমাছের মতন যে দেহটার উপরে আমি ঝাঁপিয়ে পড়েছিলুম, কমলার দেহকে দেখতে হয়েছে এখন ঠিক সেইরকম।

মাংসপিণ্ডের দিকে জ্বলন্ত দৃষ্টি নিক্ষেপ করে পণ্ডিত বললে, এইবারে আদর করে তোর অমলদাদাকে একবার ডেকে দেখা না! এখন ও আর তোর দিকে ফিরেও চাইবে না!

রাগে গা আমার জ্বলে গেল। একবার মাংসপিণ্ডের দিকে তাকালুম। তার ভিতর থেকে দুটি চোখ অত্যন্ত কাতর ও দুঃখিত ভাবে আমার মুখের পানে চেয়ে আছে! কমলার দেহ বদলেছে, কিন্তু তার চোখদুটির শ্রী এখনও ঠিক আগেকার মতনই আছে! আমি মমতা-ভরা স্বরে বলে উঠলুম, তা, না

কমলা! তোমার চেহারা বদলেছে বলে আমি তোমাকে বোনের মতনই দেখছি!

পণ্ডিত ঠাট্টা করে বললে, ও হো হো হো! লক্ষ্মী বোনের লক্ষ্মী ভাই! চমৎকার! ওরে কে আছিস রে, কমলার শ্রীখোলটা এখানে নিয়ে আয় তো!

একটা বড়ো পিপে এসে হাজির-তার হাতে একটা ছোটো পিপে!

পণ্ডিত কমলার দিকে ফিরে হুকুম দিলে, ঢোক ওর ভেতরে!

কমলার পিণ্ডাকৃতি দেহের ভিতর থেকে মিনতি-মাখা করুণ স্বর এল, বাবা গো, তোমার পায়ে পড়ি! আমলদাদার সামনে আমাকে ওর ভেতরে ঢুকতে বোলো না, লজ্জায় আমি মরে যাব!

পণ্ডিত ক্যাঁক-কেঁকে গলায় হুমকি দিয়ে বললে, চোপরাও! তুই মলে তো আমি বাঁচি! ঢোক শ্রীখোলের ভেতরে!

মাংসপিণ্ডের মাঝখান থেকে তিনখানা হাত আর তিনখানা পা বেরিয়ে পড়ল! তারপর পিণ্ডটা উঠে পিপের ভিতরে গিয়ে ঢুকল। পিপের একদিকে একখানি মুখ—তা আমার চেনা কমলার মতন দেখতেও বটে, দেখতে নয়ও বটে। তার দুই চোখ দিয়ে টসটস করে জল করছে, লজ্জায় সে আমার দিকে তাকাতে পারছে না।

পণ্ডিত বললে, আমার এই হুকুম রইল, আজ থেকে এক মাস তুই ওই শ্রীখোল ছেড়ে বেরুতে পারবি না! যাঃ, এখন নিজের ঘরে যা!

কমলা তার হাত-পা গুটিয়ে ফেললে, তারপর ধীরে ধীরে গড়াতে গড়াতে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল! আমি বুঝলুম, এই নিষ্ঠুর শত্রুপুরীতে

আমার একমাত্র যে বান্ধবী ছিল, আমার বিপদে-আপদে যে আমাকে প্রাণপণে সাহায্য করতে পারত, সে-ও আজ অসহায় ভাবে বন্দিনী হল। আজ থেকে আর কেউ আমার দিকে মুখ তুলে তাকবে না। আমার জীবনরক্ষার আর উপায় নেই!

পণ্ডিত আমার দিকে চেয়ে বললে, এইবারে তোমার পালা।

আমি গভীর ভাবে বললুম, তাহলে পালা শুরু করুন।

—আমি তোমার প্রাণরক্ষা করেছি, তোমাকে আশ্রয় দিয়েছি, তার খুব প্রতিদান তুমি দিলে বটে।

আমি বললুম, আমি কোনও অন্যায় করেছি বলে মনে পড়ছে না।

পণ্ডিত চেঁচিয়ে বললে, অন্যায় করোনি? মেয়েকে বাপের অবাধ্য করা অন্যায় নয়? তোমাদের দেশে এটা অন্যায় না হতে পারে, কিন্তু এদেশে তা মহাপাপা! যে ছেলেমেয়েরা বাপের অবাধ্য, এদেশে তাদের প্রাণদণ্ড পর্যন্ত হয় তা তুমি জানো কি?

আমি বললুম, না জানি না। জানতেও চাই না। আমি শুধু এইটুকু জানি যে, কমলাকে আমি কোনও দিন আপনার অবাধ্য হতে বলিনি।

—বলোনি? হেঃ, এই কথা আমি বিশ্বাস করব? আমি কি সেকেলে মানুষের মতন বোকা ভ্যাড়াকান্ত? আমার বুদ্ধিশুদ্ধি কি মগজ থেকে কর্পূরের মতন উপে গেছে? তুমি তাকে কুশিক্ষা না দিলে সে কি কখনও আমার বিরুদ্ধে নালিশ করবার কথা মনেও আনতে পারে? আর আমি কিনা তোমারই প্রাণরক্ষা করেছি।

আমার অসহ্য হয়ে উঠল। বললুম ‘বার বার আমার প্রাণরক্ষা করেছেন বলে জাঁক করছেন কেন? আপনি কেন যে আমার প্রাণরক্ষা করে আমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। আমি কি তা জানি না? আপনি আমার প্রাণরক্ষা করেছেন আমার প্রাণবধ করবার জন্যে!

পণ্ডিত খাপ্পা হয়ে বললেন, তোমার সঙ্গে আর আমি বাজে কথা কয়ে সময় নষ্ট করতে চাই না। যাও, নিজের ঘরে গিয়ে বন্দি হয়ে থাকো গো! আর দয়া নয়!

ভোম্বলদাসের আসল চেহারা

ঘরে ভিতরে একলা বসে যেন অকুলপাথরে ভাসছি।

বাঁচবার কোনও আশা নেই। এক আশা ছিল কমলা, কিন্তু সে-ও এখন আমারই মতন বন্দি। পণ্ডিতের ষড়যন্ত্রের কথা সে আর কারুর কাছে গিয়ে প্রকাশ করে দিতে পারবে না। এই উদ্ভট, ভূতুড়ে দেশের আইন কানুন সবই আজব! এখানকার দয়া-মায়া-ভালোবাসা সবই ভিন্নরকম। পৃথিবীর সভ্যদেশে মাঝে মাঝে ভূত-পেতনির কথা শুনতে পাই, নানানরকম মূর্তি ধারণ করে মানুষদের যারা ভয় দেখায়। সেসব এদেরই কীর্তি নয়তো? তারা রাত আঁধারে দেখা দিয়ে দিনের আলোয় কোথায় লুকোয়, তারা কোথা থেকে আসে। কেউ তা জানে না,-কিন্তু আমার বিশ্বাস, তারা এই দেশেরই লোক! মানুষ যে পরলোকের কথা জানে, সেই পরলোক হয়তো এই এই

পিপে-মুলুকাই! আমি চোখের সামনেই ভোম্বলকে আমার মূর্তি ধরতে দেখেছি। এরাই হয়তো মানুষের দেশে গিয়ে রাত্রিবেলায় আমাদের মৃত আত্মীয়স্বজনের মতন চেহারা নিয়ে দেখা দেয়, আর আমরা ভূত দেখেছি বলে ভয়ে আঁতকে উঠি! এরা নিজেদের বলে 'নতুন মানুষ'! ছাই! পিপের ভিতরে কখনও মনুষ্যত্ব থাকে না!

হঠাৎ মৃদুস্বরে কে আমায় ডাকলে, অমলা, ও অমলা!

মুখ তুলে দেখি, জানলার বাইরে ভোম্বলের মোটা, আঁচল-ভরা, বারকোসের মতন মস্ত মুখখান!

আমি রাগ করে বললুম, আবার তুমি আমাকে ওই নামে ডাকছ? আমি মরতে বসেছি বলে তোমার বুঝি খুব আহ্লাদ হয়েছে?

ভোম্বল বললে, না ভাই, চটো কেন? তুমি তো জানোই আমরা মেয়ে-পুরুষ সবাই ডিম পাড়ি-কাজেই আমাদের কাছে অমলও যে আমলাও সে! একটা আকারের তফাত বই তো নয়! যাক সে কথা, তুমি জানলার কাছে এসো। চেঁচিয়ে কথা কইলে কেউ শুনতে পাবে! যা বলতে এসেছি, চুপিচুপি বলে যাই।

জানি, এ অপদার্থটার দ্বারা আমার কোনোই উপকার হবে না, তবু সে কী বলে শোনবার জন্যে আমি উঠে জানলার কাছে গিয়ে দাঁড়ালুম।

ভোম্বল চুপিচুপি বললে, তোমার জন্যে আমি কম চেষ্টা করিনি, এখানকার যেসব মোড়ল পণ্ডিত জুজুবুড়োকে দু-চক্ষে দেখতে পারে না, তাদের অনেককেই গিয়ে ধরেছি। কিন্তু বিশেষ ফল হল না। তুমি একেবারে

অচেনা লোক, তোমার নাম পর্যন্ত কেউ জানে না! তারা বলে, কোথাকার কোন একটা বাজে জীবের জন্যে পণ্ডিতের সঙ্গে আমরা ঝগড়া করে মরতে যাব কেন? পণ্ডিতের এখানে খুব পসার। কিনা? সবাই বলে, পণ্ডিত হচ্ছে দেশভক্ত লোক, —সে যা করবে। দেশের ভালোর জন্যেই করবে!

আমি বললুম, এ খবরটা জানাবার জন্যে তোমার কষ্ট করে এখানে না এলেও চলত।

ভোম্বল দন্তবিকাশ করে বললে, তা চলত বটে। তবু না এসে থাকতে পারলুম না, হাজার হোক তুমি আমার বন্ধু তো! তা দ্যাখো অমলা, তোমার জন্যে একটা কাজ আমি করেছি। বোধহয়! মহারাজ একটা কথায় রাজি হয়েছেন। কেন যে ছুরি মেরে তোমার ভূঁড়ি ফাঁসানো হবে না, এর বিরুদ্ধে যদি তোমার কোনও যুক্তি থাকে, মহারাজা তা শুনতে আপত্তি করবেন না। যুক্তি দেখিয়ে তুমি যদি তাকে বোঝাতে পারো তাহলে তোমার ভূঁড়ি এ যাত্রা বেঁচে গেলেও যেতে পারে! কাগজে-কাজেই এক বিষয়ে তুমি নিশ্চিন্ত থাকে। তোমাকে আগে মহারাজার কাছে হাজির না করে তাঁর হুকুম না নিয়ে কেউ তোমার এই নাদুস-নধর দেহটিকে খণ্ড খণ্ড করতে পারবে না!

আমি কৃতজ্ঞ স্বরে বললুম, ভাই ভোম্বল, এ খবরটা তবু মন্দের ভালো! তোমার এ উপকারের জন্যে ধন্যবাদ!

ভোম্বল বললে, ‘ও বাজে ধন্যবাদ। আমি চাই না। আগে বাঁচো, তারপর ধন্যবাদ দিয়ে। আমার এখন খিদে পেয়েছে, আমি হোটেলে চললুম!’ জানালার ধার থেকে তার মুখ সরে গেল।

আমি ভাবতে লাগলুম, ভোম্বলকে আগে যতটা মনে হয়েছিল, এখন দেখছি সে ততটা মন্দ লোক নয়। ওর বাইরের চেহারা, হাবভাব। আর কথাবার্তা কিঞ্চিৎ অভদ্র ও এলোমেলো হলেও ওর পিপের ভিতরে প্রাণ আর দয়া-মায়া আছে। ভোম্বল দেখছি একটি বর্ণচোরা আম!

হঠাৎ জানালার ধারে আবার ভোম্বলদাসের উদয় হল। বাইরের এদিকে-ওদিকে একবার চেয়ে সে বললে, ‘হ্যাঁ ভালো কথা! খিদের চোটে একটা বিষয় ভুলে গিয়েছিলুম। এই ছোটো নলচেটা নিয়ে ভালো করে লুকিয়ে রাখো। ওর পেছনে যে কল আছে সেটিকে টিপলেই ওই নলচেটি তোমাকে সাহায্য করবে।’ আর একবার দন্তবিকাশ করে হেসেই ভোম্বল আবার অদৃশ্য হল।

নলচেটি পরখ করে দেখলুম। সেদিন মন্ত্রণাসভায় এই রকমেরই একটি নলচের বিষম মহিমা দেখেছিলুম। তবে এটি তার চেয়ে ঢের ছোটো, অনায়াসে পকেটে লুকিয়ে রাখা যায়। এই নলচেই বোধহয় পিপেদের বন্দুক!

এমন সময়ে দরজা খোলার শব্দ পেলুম। নলচেটাকে ভিতরকার জামার পকেটে লুকিয়ে রাখার সঙ্গে-সঙ্গেই ঘরের ভিতরে এসে দাঁড়াল অমরচন্দ্র, পণ্ডিত ও আরও চারজন পিপে!

পণ্ডিত বললে, অমল, তোমাকে আমাদের সঙ্গে আসতে হবে।

বুঝলুম, এরা আজকেই আমাকে মহারাজার কাছে হাজির করতে চায়। বিনা-বাক্যব্যয়ে আমি তাদের সঙ্গে চললুম! আগে আগে পণ্ডিত আর অমরচন্দ্র, আমার দু-পাশে দুজন ও পিছনে দুজন পিপে! দস্তুরমতো কড়া পাহারা!

আমার মহা বীরত্ব

সবাই মিলে যে ঘরে গিয়ে দাঁড়ালুম, সেটা হচ্ছে সেই ঘর-যেখানে এদেশে এসে আমার প্রথম জ্ঞানোদয় হয়!

আজ দেখছি সে ঘরের রূপ বদলে গেছে। মাঝখানে একটা লম্বা টেবিল, তার উপরে অনেক অস্ত্রশস্ত্র, চারিধারে তাকে তাকে হরেকরকম ওষুধ ও আরক প্রভৃতির শিশি, বোতল ও কাচের পাত্র!

অমরচন্দ্র কী একরকম সন্দেহপূর্ণ অদ্ভুত দৃষ্টিতে আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললে, ভালো করে এর চেহারা দেখে আজ মনে হচ্ছে, এর দেহ দিয়ে বোধহয় আমাদের কার্যসিদ্ধি হবে না।

পণ্ডিত বললে, হোক আর নই-ই হোক, পরীক্ষণ আমি করবই।

আমি সাভয়ে জিজ্ঞাসা করলুম, আপনারা আমাকে এখানে নিয়ে এলেন কেন?

পণ্ডিত বললে, তোমাকে নিয়ে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করব বলে!

আমি উদ্বিগ্ন স্বরে বললুম, কীরকম? মহারাজার হুকুম কি আপনি জানেন না? আগে আমাকে তার কাছে নিয়ে যেতে হবে!

পণ্ডিত বিপুল বিস্ময়ে খানিকক্ষণ অবাক হয়ে রইলেন। তারপর বললেন, এ কথা কে তোমাকে বলেছে?

যেইই বলুক, আপনি আগে আমাকে মহারাজার কাছে নিয়ে চলুন।

অমরচন্দ্র দাঁত ছরকুটে বললে, তা আর জানি না! সেখানে আমাদের শত্রুপক্ষ আছে, তুমি আমাদের হাত ফসকে কলা দেখিয়ে পালাও আর কী?

আমি বললুম, সে কী, আপনারা মহারাজার হুকুম মানবেন না?

পণ্ডিত ঘন ঘন ঘাড় নেড়ে বললে, না, না, না! বিজ্ঞানের মর্যাদা রাখবার জন্যে আমরা মহারাজার হুকুম মানব না।' তারপর পিপেদের দিকে ফিরে বললেন, তোরা ওকে ধর! ওর হাত-পা বেঁধে টেবিলের উপর শুইয়ে দে!

এবারে রাগে অজ্ঞান হয়ে একলাফে পণ্ডিতের উপরে লাফিয়ে পড়ে মারলুম। আমি তাকে এক লাথি-সে বিকট আর্তনাদ করে মাটির উপরে গড়িয়ে গেল! কিন্তু ততক্ষণে চারজন প্রহরী পিপে আমাকে সবেগে আক্রমণ করেছে!

টেবিলের উপরে বোধকরি আমারই দেহ কাটবার অস্ত্রগুলো ছড়ানো ছিল, আমি বিদ্যুতের মতন হাত বাড়িয়ে একখানা মস্ত ধারালো ছুরি তুলে নিয়ে দিগ্বিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ডাইনে-বাঁয়ে সামনে-পিছনে চালাতে লাগলুম! বেটাদের গায়ে তো হাড় ছিল না, —আমার ছুরি তাদের হাতে-পায়ে যেখানে

পড়ে সেইখানটাই কচুর মতন কাঁচ করে কেটে উড়ে যায়! তারা হাউমাউ করে কেঁদে উঠে। সেখান থেকে টেনে লম্বা দিলো! ঘরের মেঝেতে পড়ে তাদের কাটা হাত-পাগুলো টিকটিকির কাটা ল্যাজের মতন ধড়ফড় করতে লাগল!

তারপর আমি অমরচন্দ্রের দিকে ফিরে দাঁড়ালুম, কিন্তু চোখের পলক না ফেলতেই সে তার পিপের ভিতর থেকে টিপং করে মাটির উপরে লাফিয়ে পড়ল এবং একটা বড়ো সাপের মতন কিলবিল করতে করতে দরজার ভিতর দিয়ে বেগে অদৃশ্য হল!

তারপর আমি পণ্ডিতের দিকে ফিরে দাঁড়ালুম-সে তখন ভীষণ চিৎকার করে চাকরদের ডাকাডাকি করছে!

আমি গর্জন করে বললুম, তবে রে জুজুবুড়ো! এবারে তোকে কে রক্ষা করে? আয়, আজ আমি তোরই অস্ত্র-চিকিৎসা করি'-বলেই ছুরি উঁচিয়ে আমি তাকে আক্রমণ করলুম। দারুণ আতঙ্কে পণ্ডিতের মুখ তখন মড়ার মতন সাদা হয়ে গেছে, চোখদুটো কপালে উঠেছে! হঠাৎ তার পিপের নীচে থেকে অনেকগুলো ঠ্যাং বেরিয়ে পড়ল এবং সেই বড়ো টেবিলটার চারিপাশ ঘিরে ঠিক একটা প্রকাণ্ড মাকড়সার মতন এত বেগে ছুটতে আরম্ভ করলে যে, আমি কিছুতেই তার নাগাল ধরতে পারলুম না!

মাত্র দুই পায়ে ভর দিয়ে অতগুলো পায়ের সঙ্গে পাল্লা দেওয়া সম্ভব না হলেও আমি পণ্ডিতের পিছু ছাড়লুম না-সে-ও ছোটে, আমিও ছুটি। এই ব্যাপার আরও কতক্ষণ চলত এবং কীভাবে শেষ হত তা আমি জানি না,

কিন্তু আচম্বিতে বাহির থেকে দলে দলে নানা আকারের পিপে এসে ঘরের ভিতর ঢুকে পড়ল—তাদের সর্বাগ্রে রয়েছে ভোম্বলদাস!

কে একজন হোমরা-চোমরার মতন ভারিক্কে গলায় বলে উঠল, এসব কাণ্ডের অর্থ কী?

পণ্ডিত পরিত্রাহি চিৎকার করে বললে, মহারাজ, রক্ষা করুন! মহারাজ, রক্ষা করুন! মহারাজ? ফিরে দেখি ভোম্বলদাসের চেয়েও ঢের মোটা আর ডাগর একটা পিপে যে-রকম পিপেতে আমাদের দেশে সিমেন্ট রাখা হয় তার চেয়েও বড়ো! তার গালদুটো লাউয়ের মতন ফোলা ফোলা এবং তার গোঁফজোড়া এত লম্বা যে ঠোঁটের দু-পাশ দিয়ে ঝুলে পড়েছে। এই হল এদের মহারাজের মূর্তি?

মহারাজার মস্তবড়ো ঢাকের মতন মুখের ভিতর থেকে ট্যাপারির মতন দুটো ছোট্ট চোখ কোটরের ভিতর থেকে প্রায় একহাত বাইরে বেরিয়ে এসে আমাকে দুই মিনিট ধরে ঘুরেফিরে নিরীক্ষণ করলে। তারপর চোখদুটোকে আবার যথাস্থানে ফিরিয়ে নিয়ে এসে মহারাজা আমাকে সম্বোধন করে জলদগভীর স্বরে বললেন, তুমি পাগল নও তো? তোমাকে দর্শন করে আমার কিন্তু তাই বিবেচনা হচ্ছে।

আমি এত দুঃখেও হেসে ফেলে বললুম, আজ্ঞে না মহারাজী! আমি এখনও পাগল হতে পারিনি! তবে শীঘ্রই হতে পারব বলে আশা রাখি।

মহারাজা দুলতে দুলতে বললেন, শুনে সুখী হলুম। যাদের পাগল হবার আশা নেই, তারা অতিশয় অভাগা।.উঃ, বড্ড হাঁপিয়ে পড়েছি, ভারী জল-তেষ্টা!...তৃত্য! সুশীতল বারি আনয়ন করে!

ভৃত্য জল এনে দিলে। মহারাজা ঢকঢ়ক করে জল পান করে উর্ধ্বমুখে বললেন, আঃ!...এইবারে রাজকার্য। ওহে ভোম্বলদাস, তুমি এই বিদেশি লোকটির কথাই না। আমার কাছে উত্থাপন করেছিলে? হুঁ। ওর নাম কী?

ভোম্বল আমার দিকে চেয়ে দন্তবিকাশ করে বললে, অমলা।

আমি বললুম, আজ্ঞে না মহারাজ! আমার নাম অমলা নয়, অমল।

মহারাজা আমার দিকে কটমট করে তাকিয়ে বললেন, 'চুপ করো। তোমার অপেক্ষা ভোম্বলদাসকে আমি বেশি চিনি। তোমার কী নাম হওয়া উচিত, তোমার চেয়ে ভোম্বলদাস তা বেশি জানে! তোমাকে দেখেই মনে হচ্ছে, তোমার নাম অমলা।...উঃ ভয়ংকর গ্রীষ্ম, ঘর্মে প্লাবিত হয়ে গেলুম যে!.. শীঘ্র ব্যজনী আনয়ন করো!'

দুদিকে দুটো পিপে এসে তালপাতার পাখা নেড়ে মহারাজের মাথা ও গতির ঠান্ডা করতে লাগিল।

খানিকক্ষণ বায়ুসেবন করে একটু ধাতস্থ হয়ে মহারাজা আবার দুলতে দুলতে বললেন, হাঁ, ভালো কথা! আচ্ছা অমলা, তুমি এতক্ষণ কী করছিলে? পণ্ডিতের সামনে দাঁড়িয়ে কি যুদ্ধের নৃত্য দেখাচ্ছিলো? ও নৃত্যটি আমার অত্যন্ত উত্তম লেগেছে। আর-একবার ওই নৃত্যটি আরম্ভ হোক!

আমি হাতজোড় করে বললুম, আজ্ঞে না মহারাজ! কী করে অস্ত্রচিকিৎসা করতে হয়, পণ্ডিতকে আমি দেখিয়ে দিচ্ছিলুম!

মহারাজা গর্জন করে বললেন, কী! তুমি কি অবগত নও যে, এ রাজ্যে অস্ত্রচিকিৎসা নিষিদ্ধ? আমরা কবিরাজি ঔষধ ছাড়া আর কিছু সেবন করি না?...তার চেয়ে পণ্ডিতকে তুমি বিষ-বড়ি ভক্ষণ করতে দিলে না কেন?

আমি আবার হাত জোড় করে বললুম, আজ্ঞে, বিষ-বড়ির কথা আমার মনে ছিল না। তাহলে সেই ব্যবস্থাই করতুম।

পণ্ডিত কী বলতে যাচ্ছিল, কিন্তু মহারাজা দু-চোখ রাঙিয়ে এক ধমক দিয়ে বলে উঠলেন, স্তব্ধ, হও! বৃদ্ধ, তুমি কি অবগত নও, আমি সম্বোধন না করলে আমার নিকটে কেউ বাক্য উচ্চারণ করতে পারবে না?..উঃ, ভীষণ কান চুলকোচ্ছে, গেলুম যে!...তৃত্য! কান-খুশকি আনয়ন করো।

কান-খুশকি এলো। মহারাজা দু-চোখ বুজে খুব আরাম করে পাঁচ মিনিট কান চুলকোলেন। তারপর সহসা দুই চোখ চেয়ে হুঙ্কার দিয়ে উঠলেন, অতঃপর?

আমি বললুম, মহারাজ, আপনি বোধহয় জানেন না যে, এই পণ্ডিত আজ ছুরি দিয়ে মহারাজা ভয়ানক চোট উঠে বললেন, কী! তোমাকে আমার কাছে হাজির না করেই?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! পণ্ডিত বলে সে বিজ্ঞানের মর্যাদা রাখবে, আপনার মর্যাদা রাখবে না।

মহারাজা দুই চক্ষু ছানাবড়া করে বললেন, “অ্যা! অ্যা! এত বৃহৎ কথা! আমার মর্যাদা রাখবে না?..উঃ, মস্তক বেজায় ঘূর্ণায়মান হচ্ছে। —বোঁ বোঁ বোঁ!...তৃত্য! অবিলম্বে আমার শিরোঘুর্ণন বন্ধ করো!

পিপের একমুখে মহারাজের গোল মাথাটা চরকির মতন এমন বন বন করে ঘুরছিল যে তাঁর চোখ-নাক-ঠোঁট কিছুই দেখা যাচ্ছিল না! ভৃত্য তাড়াতাড়ি ছুটে এসে মাথাটা প্রাণপণে চেপে ধরে তার ঘুরুনি বন্ধ করে দিলে।

খানিকক্ষণ হাঁপাতে হাঁপাতে দম নিয়ে মহারাজা বললেন, দুরাচার পণ্ডিত!! আমার হুকুম না নিয়েই আবার তুমি লম্বালম্বি ভাবে মানুষের দেহ কর্তন করতে চাও?...ভোম্বলদাস! সেবারের সেই কাণ্ড-কারখানার কথা তোমার মনে আছে?

ভোম্বল চোখ পাকিয়ে বললে, ওঃ! মনে নেই। আবার? পণ্ডিত সেই তুর্কি-চাচার দেহখানা এমন লম্বালম্বি ভাবে কেটেছিল যে, তাকে দেখতে হয়েছিল ঠিক পণ্ডিতেরাই মতন!

পণ্ডিত প্রবল প্রতিবাদ জানিয়ে মাথা নেড়ে বললে, না, তাকে আমার মতন দেখতে হয়নি। আমি এ কথার আপত্তি করি।

মহারাজা বললেন, আবার তুমি গায়ে পড়ে বাক্য উচ্চারণ করছ? তুমি আপত্তি করতে পারবে না। কখন তোমার আপত্তি করা কর্তব্য, সে কথা আমি নিজেই বলে দেব।

পণ্ডিত বললে, কোন কথায় আমি আপত্তি করব, সে-কথা। আপনি জানবেন কেমন করে মহারাজ?

মহারাজা মহাবিস্ময়ে মুখব্যাদান করে বললেন, ওহে ভোম্বল, পণ্ডিতটা বলে কী হে? কোন কথায় ওর আপত্তি করা উচিত, তাইই যদি না বলতে পারব, তবে আমি কীসের মহারাজ?

ভোম্বল বললে, সত্যিই তো! তবে আপনি কীসের মহারাজা?

পণ্ডিত বললে, মহারাজা! আমি বিচার প্রার্থনা করি।

মহারাজা বললেন, বিচার? তুমি বিচার প্রার্থনা করে? ওহে ভোম্বল, পণ্ডিতটা যে বিচার প্রার্থনা করে! বেশ, আমি বিচার করব। ভোম্বলদাস, তুমি মন্ত্রীদের আসতে হুকুম দাও। আজ এখানেই আমার বিচারসভা বসরে। ভৃত্য! আমার রাজদণ্ড আনয়ন করো।

মহারাজের বিচার

রাজদণ্ড হাতে নিয়ে আরও বেশি গভীর হয়ে মহারাজা বললেন, পণ্ডিত! এই সেকেলে মানুষটার দেহ কেন তুমি লম্বালম্বি ভাবে কর্তন করতে চাও, সে কথা আমার নিকটে যথাবিহিতসম্মানসহকারে নিবেদন করো।

পণ্ডিত বললে, আজ্ঞে, আমাদের চেয়েও একেলে মানুষ সৃষ্টি করব বলে।

মহারাজ ভুরু কুঁচকে বললেন, আমাদের চেয়েও আধুনিক? তবে কি তুমি বলতে চাও যে, আমরা ক্রমেই প্রাচীন হয়ে পড়ছি?

—আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! আমার তাই বিশ্বাস। মনে করে দেখুন মহারাজ, আমাদের চেয়েও একেলে মানুষদের মধ্যে সর্বপ্রথম মানুষ হত। ওই অমল! এ একটা কত বড়ো সম্মান!! আমি ওকে হত্যা করতুম না, খুব আস্তে আস্তে একটু একটু করে ওর দেহটাকে জ্যান্ত অবস্থাতেই লম্বালম্বি ভাবে কাটতুম। এ কাজে কুড়ি দিনের বেশি সময় লাগত না। ভেবে দেখুন মহারাজ আমার উদ্দেশ্য কত সাধু!

মহারাজা মাথা নাড়তে নাড়তে বললেন, হ্যাঁ, তোমার উদ্দেশ্য যে সাধু, সে বিষয়ে কোনোই সন্দেহ নেই। অমলা, তুমি পণ্ডিতের সাধু উদ্দেশ্যে বাধা প্রদান করতে গিয়েছিলে কেন?

আমি বললুম, না মহারাজ, পণ্ডিতকে আমি বাধা দিইনি-আমি কেবল আত্মরক্ষা করেছিলুম। ওঁর মনকে খুশি রাখবার জন্যে বিশ দিন ধরে জ্যান্ত অবস্থায় একটু একটু করে কচুকাটা হব, অথচ টুঁ শব্দটি পর্যন্ত উচ্চারণ করব না, এই কি আপনার আদেশ মহারাজ?

মহারাজা বললেন, না, এমন অন্যায় আদেশ কদাপি আমি প্রচার করি না!

আমি বললুম, তারপর আর একটা কথা মহারাজ বিচার করে দেখুন। আপনাকে আগে জানিয়ে পণ্ডিত যদি আমার ওপরে ছুরি চালাত,

তাহলে কখনোই আমি আত্মরক্ষার চেষ্টা করতুম না, কিন্তু পণ্ডিত আপনার একটা হুকুম পর্যন্ত নেয়নি। এটা কি অপরাধ নয়?

মহারাজা বললেন, অপরাধ নয়। আবার? মহাগুরুতর অপরাধ!...তৃত্য! আমার আইন পুস্তকের পঞ্চম খণ্ড আনয়ন করে...দেখি, এটা কত ধারার অপরাধ!

আইনের বই এল। মহারাজ পাতা উলটে বললেন, এই যে! এটা সাতশো সাতাশ ধারার অপরাধ! এর শাস্তি-প্রাণদণ্ড। পণ্ডিত! তোমার প্রাণদণ্ড হবে!

পণ্ডিত ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ে বললে, মহারাজ, রক্ষা করুন! প্রাণদণ্ড দিলে আমি আর কিছুতেই বাঁচব না! এখনও আপনি সব কথা শোনেননি! ওই সেকেলে মানুষটা আমার মেয়েকে আমার অবাধ্য করে তুলেছে,—

মহারাজা শিউরে উঠে বললেন, অ্যাঁ, বলো কী? মেয়েকে পিতার অবাধ্য করে তোলা! এ যে সাতশো ধারার চেয়েও গুরুতর অপরাধ! অমলা! তোমার কি কিছু বক্তব্য আছে?

আমি মনে মনে প্রমাদ গুনে বললুম, আছে মহারাজ! আগে আপনি গোড়া থেকে সব কথা শুনুন। কাল যখন আমি বসে বসে বাজনা বাজাচ্ছিলুম—

মহারাজা বললেন, বটে, বটে, বটে! তুমি বাজনা বাজাতে পারো?

—পারি মহারাজ!

—তুমি গান গাইতে পারো?

—পারি মহারাজ।

—বটে, বটে, বটে! একটা গান আমাকে শোনাও না!

আমি দুই হাত জোড় করে বললুম, কিন্তু মহারাজ, আমি হচ্ছি ওস্তাদ লোক। তবলা-বাঁয়ার সঙ্গত না থাকলে কেমন করে গান গাইব?

মহারাজা ব্যস্তসমস্ত হয়ে আদেশ দিলেন—ভূত্য? তবলা-বাঁয়া আনয়ন করো।

ভোম্বলদাস তাড়াতাড়ি মহারাজের কানো-কনে কী বললে। মহারাজা সব শুনে আমার দিকে ফিরে বললেন, অমলা! এটা হচ্ছে অস্ত্রোপচারের গৃহ-এখানে তবলা-বীয়া থাকে না। এখন উপায়?

আমি বললুম, উপায় আছে মহারাজ! পণ্ডিতমশাইয়ের গাল দু-খানা দিব্যি চ্যাটালো। ওঁকে আমার কাছে আসতে হুকুম দিন। তবলা-বঁয়ার অভাবে আমি ওঁর দুটো গাল দু-হাতে বাজিয়ে তাল রেখে গান গাইতে পারব।

পণ্ডিত বললে, মহারাজ, আমি এ প্রস্তাব সমর্থনা করি না।

মহারাজা প্রকাণ্ড এক ধমক দিয়ে বললেন, পুনরায় তুমি বাচালতা প্রকাশ করছ? অমলার ন্যায়সঙ্গত প্রস্তাব তোমাকে সমর্থন করতেই হবে! যাও অমলার কাছে!

পণ্ডিত নিরুপায় হয়ে ভয়ে ভয়ে আমার কাছে এসে দাঁড়াল। কিন্তু যেই আমি হাত তুলে তার গালে চপেটাঘাত করতে যাব, অমনি সে মুখ

সরিয়ে নিলে! আর-একবার চেষ্টা করেও বিফল হয়ে আমি বললুম, মহারাজ, পণ্ডিতমশাই তার গাল বাজাতে দিচ্ছেন না!

মহারাজা বলেলেন, বটে, বটে, বটে। প্রহরীগণ! দুষ্ট পণ্ডিতকে তোমরা ধৃত করো।

প্রহরীরা তখন এসে পণ্ডিতকে আষ্টেপৃষ্ঠে চেপে ধরলে এবং আমিও দুই হাতে মনের সাধে তালে তালে তার দুই গালে চড় মারতে মারতে গান ধরলুম—

‘জুজুবুড়ির দেশে এসে
দেখেছি এক জুজুবুড়ো,
মামদো-ভূতের সমন্দী সে,
হামদো-মুখের বাবা-খুড়ো—
দেখেছি এক জুজুবুড়ো।
চোখদুটো গোল পানের ডিপে,
পেটের ওপর একটা পিপে,
বাক্যিগুলি মিষ্টি কত!
ঠিক যেন ভাই লঙ্কাগুঁড়ো—
দেখেছি এক জুজুবুড়ো।

করলে আদর ধমকে ওঠেন,

ধরলে গীতি চমকে ছোটেন,
থমকে হঠাৎ পটকে লোঠেন—
মেজাজটি তাঁর উড়ো-উড়ো—
দেখেছি এক জুজুবুড়ো।

তিনি যদি আসেন কাছে,
দৌড়ে চোড়ো শ্যাওড়া-গাছে,
ওপর থেকে থুতু দিয়ো,
কিংবা ছেঁড়া জুতো ছুড়ো—
দেখেছি এক জুজুবুড়ো।'

মহারাজা ঘাড় নেড়ে তারিফ করে বললেন, আ-হা-হা-হা! সাধু, সাধু, খাসা গলা! না। ভোম্বল?

ভোম্বল বললে, খাসা।

পণ্ডিত তার দুই গালে হাত বুলোতে বুলোতে বললে, মহারাজ, এ গানে আমি আপত্তি করি।

মহারাজা বললেন, না, তুমি আপত্তি করবে না। তুমি কোথায় আপত্তি করবে, আমি বলে দেব।

পণ্ডিত বললে, মহারাজ, ও গান আমাকে লক্ষ্য করে লেখা হয়েছে।

মহারাজা বললেন, তুমি কি নিজেকে জুজুবুড়ো বলে মানো?

পণ্ডিত বললে, না, আমি মানি না।

মহারাজা বললেন, তাহলে ও-গানে তুমি আপত্তি করতে পারো না। ওটা জুজুবুড়োর গান। না অমলা?

আমি বললুম, আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজা!

ভোম্বল বললে, মহারাজ, রাজকার্যে বেলা বাড়ছে। আমার খিদে পেয়েছে।

মহারাজা বললেন, ভেম্বলের খিদে পেয়েছে। আমি আর দেরি করতে পারি না।

অমলা! পণ্ডিত! তাহলে আমার আজ্ঞা শোনো! তোমরা দুজনেই গুরুতর অপরাধ করেছ। তোমাদের দুজনেরই প্রাণদণ্ড হবে। মন্ত্রীগণ! এখন কার প্রাণদণ্ড আগে হবে, সেটা তোমরাই স্থির করো। কিন্তু বেশি দেরি কোরো না। ভেম্বলের খিদে পেয়েছে।

মন্ত্রীগণ বেশি দেরি করলেন না। বললেন, অমলার অপরাধ গুরুতর। আগে ওরই প্রাণদণ্ড হওয়া উচিত।

মহারাজা বললেন, এইজন্যেই তো মন্ত্রীগণের দরকার! কত তাড়াতাড়ি কাজ হয়ে গেল! অমলা!! মন্ত্রীগণের কথা স্বকর্ণে শ্রবণ করলে তো? অগ্রে তোমারই প্রাণদণ্ড হবে। পণ্ডিত! তুমি অমলাকে ওই টেবিলটার ওপরে শুইয়ে ওর দেহ লম্বালম্বি ভাবে কর্তন করো!

আমি চক্ষে সর্ষের ফুল দেখতে লাগলাম! যেমন হবুচন্দ্র রাজা, তেমনি গবুচন্দ্র মন্ত্রী! এখন উপায়? অত্যন্ত অসহায় ভাবে ভোম্বলের দিকে তাকালুম।

ভোম্বল দন্তবিকাশ করে কী যেন ইশারা করতে লাগল।

তার ইসারায় একটা কথা আমার মনে পড়ে গেল। তাড়াতাড়ি ভিতরকার জামার পকেটে হাত দিয়ে দেখি সেখানে নলচেটা এখনও আছে!

মহারাজ বললেন, অমলা! তোমার বোধহয় আর কিছু বলবার নেই?

আমি বললুম, মহারাজ! আমার আর দুটো কথা বলবার আছে।

মহারাজা বললেন, তাড়াতাড়ি বলো। ভোম্বলের খিদে পেয়েছে?

আমি বললুম, মহারাজ! আমার প্রথম কথা হচ্ছে, আপনি আমাকে অমলা বলে ডাকতে পারবেন না। আমার দ্বিতীয় কথা হচ্ছে, আমার প্রাণদণ্ডের হুকুম আপনাকে নাকচ করতে হবে।

মহারাজা বললেন, আমি যদি তোমার ও-দুটো কথা না শুনি?

পকেট থেকে নলচে বার করে মহারাজার মাথার কাছে ধরে আমি বললুম, তাহলে এখনই আমি নলচে ছুঁড়ব।

মহারাজা ব্যস্ত হয়ে হাঁক দিলেন, প্রহরী! প্রহরী!

আমি বললুম, প্রহরীরা এদিকে আসবার আগেই এ রাজ্যের সিংহাসন খালি হবে।

মহারাজা বললেন, প্রহরীগণ! তোমরা শীঘ্র বিদায় হও, এদিকে এসো না-খবরদার!

ভোম্বল বললে, মহারাজ! আমার খিদে পেয়েছে।

মহারাজা বললেন, আচ্ছা, তোমাকে আর অমলা বলে ডাকব না। তোমার প্রাণদণ্ডও হবে না।

নলচে নামিয়ে আমি বললুম, মহারাজের জয় হোক!

মহারাজা বললেন, কিন্তু প্রাণদণ্ডের বদলে তোমাকে নির্বাসনদণ্ড দিলুম। তুমি এ রাজ্যে থাকবার উপযুক্ত নও। ভোম্বলের খিদে পেয়েছে। অতএব সভা ভঙ্গ হোক।

আমার নির্বাসন

দলে দলে পিপে-প্রহরী চারিদিক থেকে আমাকে ঘিরে ফেললে এবং আমার হাত থেকে নলচেটা কেড়ে নিলে।

তারপর রাজপথ দিয়ে আমাকে নিয়ে চলল।

যেদিকে তাকাই সেইদিকেই দেখি, পিল পিল করে পিপের দল ছুটে আসছে। পুরুষপিপে, মেয়ে-পিপে, খোকা-পিপে, খুকি-পিপে! এ দেশে এত পিপে-মানুষ আছে, আমি তা কল্পনাও করতে পারিনি!

প্রত্যেক পিপেই আমার উপরে মারমুখো হয়ে আছে! তাদের মহারাজের বিরুদ্ধে আমি যে নলচে ধরে দাঁড়িয়েছি, এ কথা বোধহয় দিকে দিকে রটে গেছে! পদে পদে আমার ভয় হতে লাগল—এই বুঝি তারা

আমাকে আক্রমণ করতে আসে! কিন্তু তারা আক্রমণ করলে না, সকলে মিলে কেবল আমাকে ভয়ানক বিশ্রী মুখ ভ্যাংচাতে লাগল।

মহারাজার চাকা-গাড়ি আমার পাশ দিয়ে চলে গেল। মহারাজ আমার দিকে ফিরেও তাকালেন না, কিন্তু তীর পাশে বসে ভোম্বলদাসও আমাকে যাচ্ছেতাই মুখ ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে গেল।

আমি চিৎকার করে ডাকলুম—মহারাজা! মহারাজা!

মহারাজার চাকা-গাড়ি থামল। গাড়ির উপরে ফিরে বসে মহারাজা বললেন, "আমাকে পিছু ডাকলে কেন? কী ব্যাপার?

আমি বললুম, একটা নালিস আছে।

—আবার কীসের নালিস?

—ভোম্বল আমাকে মুখ ভ্যাংচাচ্ছে।

মহারাজা আমার দিকে সন্দিগ্ধ চোখে তাকিয়ে বললেন, তোমার কাছে সেই নলচেটা নেই তো?

আমি বললুম, না মহারাজ, প্রহরীরা সেটা কেড়ে নিয়েছে।

মহারাজা বললেন, তাহলে ভোম্বল অনায়াসেই তোমাকে মুখ ভ্যাংচাতে পারে। খিদে পেলে ভোম্বল আমাকেও মুখ ভ্যাংচায়। না ভেম্বল?

ভোম্বলদাস আবার আমাকে মুখ ভ্যাংচাতে ভ্যাংচাতে বলে, আজ্ঞে হ্যাঁ মহারাজ! কিন্তু ওই যাঃ! একটা ভারী ভুল হয়ে গেল তো!

মহারাজা ভয়ানক চমকে উঠে বললেন, অ্যাঃ বলো কী ভুল হয়ে গেছে? কী ভুল?

ভোম্বল বললে, মহারাজ, পণ্ডিতের প্রাণদণ্ডটা তো হল না!

মহারাজা একগাল হেসে বললেন, ওঃ, এই ভুল? তার জন্যে আর ভাবনা কী?

পণ্ডিতও তো আর নির্বাসনে যাচ্ছে না, আগে তোমার খিদে ঠান্ডা হোক, তারপর তাকে ধরে এনে প্রাণদণ্ড দিলেই হবে!...গাড়োয়ানগণ! গাড়ি চালাও!

মহারাজার চাকা-গাড়ি বোঁ-বোঁ করে চোখের আড়ালে মিলিয়ে গেল!

প্রহরীরা একখানা কাপড়ে আমার চোখ বেঁধে দিলে। এ রাজ্যে আসবার পথ-ঘাট পাছে আমি চিনে রাখি, বোধহয় সেই জন্যেই এই ব্যবস্থা!

এক দিন এক রাত পরে এক জায়গায় এসে তারা আমার চোখের বাঁধন খুলে দিলে। চেয়ে দেখি, আমি আবার জুজু পাহাড়ের উপরে দাঁড়িয়ে আছি!

প্রহরীরা সবাই হাত তুলে কড়া গলায় বললে—বিদেয় হও!

হঠাৎ প্রহরীদের পিছনে আমার চোখ গেল।

দেখি একটি গুহার সামনে স্নানমুখে দাঁড়িয়ে আছে—কমলা!

প্রহরীরা বললে, এখনও গেলে না? যাও বলছি।

বিমর্ষ প্রাণে চলে এলুম। মনে হল, আমার বোনকে আমি পিছনে ফেলে রেখে যাচ্ছি! মন কাঁদতে লাগল।